কুন্তীবাঈ

নিশাচর

প্রাপ্তিস্থান

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কুন্তাবাঈ

॥ এই লেখকের ॥

ভিয়েনা নার্সিং হোম

স্বলতার বিয়ে

রায়বাড়ি (যন্ত্রস্থ)

প্রতিমা মিত্র

শ্রীচরণেষু

শিশমহলের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় মালা।

দিদির বড় প্রিয় শিশমহল।…কুন্তীবাঈয়ের প্রাণপ্রতিম এই শিশমহল।…বহু রাজা-মহারাজা মন্ত্রী-উপমন্ত্রী সাধারণ-অসাধারণ লোকের পায়ের ধুলোয় ধন্য এই শিশমহল।

চোখ তুটো ঝাপসা হয়ে আসে মালার স্মৃতির বন্ধ তুয়ারে ধাক্কা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কোথায় আজ এই শিশমহলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাত্রী? কোথায় আজ তার সেই পরম প্রিয় আদরণীয় স্নেহময়ী দিদি কুন্তলা? কোথায় আজ সেই কুন্তীবাঈ—যার চঞ্চল চরণের নূপুর নিকণে শিশমহলের প্রতিটি রন্ধ্র দিনে-রাতে মুখরিত হয়ে থাকত?

না—না—না! অস্ফুট কণ্ঠের একটা জান্না-জড়ানো স্বর বেরিয়ে আসে মালার কণ্ঠ ভেদ করে। তীব্রভাবে মাথা নেড়ে দেহ তুলিয়ে সে প্রতিবাদ করে বলতে চায়—না-না-না—সে আর ভাবতে পারে না…সে আর ভাবতে চায় না…যে-কথা ভাবা আজ সে ছেড়ে দিয়েছে দীর্ঘ এক বছর, যে-ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে এক বছর আগে, সেই পুরনো স্মৃতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলার কেন এই প্রয়াস?…সে চায় না সেই স্মৃতিকে আবার তার মানসপটে তুলে ধরতে।

ওঃ, সে কী হৃদয়-বিদারক—কী বীভৎস দৃশ্য!

বিষে জর্জরিত অমন সুশ্রী সুন্দর মুখখানি নীল হয়ে গিয়েছে, শরীরটা তুমড়ে-মুচড়ে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে, হাতে-পায়ে খিল ধরে আসছে……

কিন্তু কী পার্থক্য সেদিনের সঙ্গে আর ঠিক তার আগের দিনের আনন্দোচ্ছল হাস্যোজ্জ্বল কুন্তীবাঈয়ের—না-না, ঠিক আনন্দোচ্ছল নয়, তুরন্ত 'ফ্লু' তার মুখের হাসি মনের উজ্জলতা অনেকখানি হরণ করে নিয়েছিল—সে জায়গায় একটা বিষণ্ণ ম্লানিমায় ছেয়ে গিয়েছিল তার অন্তর-দ্বার, একটা নৈরাশ্যে, একটা হাহাকারে, কী রকম একটা অবসাদে

করুণ ও ম্রিয়মান করে তুলেছিল তাকে…অন্তত সে-রকমই সপ্রমাণিত হয় করোনারের আদালতে তার মৃত্যুর পর। মালা নিজে সে 'রায়'কে মেনে নিয়েছিল। কেন নেবে না? বাইরে থেকে লোকচক্ষুর সামনে থেকে কোর্টের বিচারে যেটা সত্য বলে প্রমাণিত হল, সেই ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলে মেনে নিয়ে সে তো কিছু অন্যায় করে নি!

তার পর এই একটা বছর ধরে সে চেষ্টা করে এসেছে সেই স্মৃতিকে ভুলবার—তার মন থেকে মুছে ফেলবার। কী সার্থকতা আর সে স্মৃতিকে জাগরূক রাখার?

কিন্তু এখন, এখন সে বুঝতে পারছে—আছে, প্রয়োজন আছে, সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে আবার মানসপটে জাগরূক করার। কালের করালগ্রাসে যে ঘটনার শান্ত সমাহিত হয়েছিল, সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতের পৃষ্ঠায় আবার ফিরে যেতে হবে…প্রত্যেক ঘটনা প্রতিটি নিষ্প্রয়োজনীয় টুকরো টুকরো ব্যাপারকে আবার বিচার করে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে…

সুব্রত—সুব্রতই তার মনে সে ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছে। কাল রাত্তিতে সে যে সন্দেহের বিষ তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তারই জ্বালা যেন তাকে আজ এক দুর্বার আকর্ষণে টেনে নিয়ে এসেছে এই শিশমহলের দ্বারপ্রান্তে।

কিন্তু সত্যিই কি তা সম্ভব? মন যে বিশ্বাস করতে চায় না! তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই ভীতিদায়ক।…

আচ্ছা, সত্যিই কি এটা অপ্রত্যাশিত? আগে কি বোঝা যায় নি এটা একেবারেই? সুব্রতর গম্ভীর প্রকৃতি, তার অন্যমনস্কতা, তার উদাস ভাব, তার অদ্ভুত কার্যকলাপ—সবটাই যেন কেমন-কেমন ঠেকছিল না আজ কদিন ধরে! তার পর কাল রাত্তিরের ঘটনা। হঠাৎ ওভাবে অত রাত্তিরে তার শোবার ঘরে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া ও তার পর চিঠিখানা ড্রয়ার থেকে বার করে দেখানো!…

সত্যিই কোন উপায় নেই আর না ভেবে। তার দিদি কুন্তীর পুরনো দিনের স্মৃতির তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত ঘটনা—সব যেন হুড়মুড় করে এসে তার মনের মণিকোঠায় ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে।

তার প্রিয় বোন কুন্তলা—কোন দিন বোধ হয় মালা তাকে আজকের

মত ঠিক স্মরণ করে নি, কোন দিন বোধ হয় সে এভাবে তার মন-প্রাণ সব জুড়ে বসে নি। ছোটবেলার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আজ যেন বায়োস্কোপের ছবির মত মনের পর্দায় ভেসে ভেসে উঠছে।

মাত্র চার বছরের বড় ছিল কুন্তলা তার চেয়ে।

বরাবর সকলকার প্রিয়—কারণ তার নাকি অগাধ টাকা। সকলেই তাকে ভালোবাসে, আদর করে, তাকে খুশি করার চেষ্টা করে।

কিন্তু দিদি যদি কুবেরের সম্পত্তির মালিক হয়, সেও কি তাই নয়? সে কি দিদিরই বোন নয়? তবে কেন এই তারতম্য ভালোবাসায়?

মা—মাও দিদিকেই বেশি ভালোবাসত তার চেয়ে। শুধু ভালোবাসা নয়, মা যেন একটু সমীহ করেও চলত দিদিকে। কিরকম একটা ভয়-ভয় ভাব, একটা লুকোচুরির খেলা সর্বদা চলত দিদির সঙ্গে মায়ের। অনেক কথা মা লুকোবার চেষ্টা করত দিদির কাছে।

তবুও মা দিদিকেই ভালোবাসত বেশি। স্কুল থেকে এলে প্রথমে দিদিকেই খাবার দিত, মুখ-হাত ধুয়ে দিত, চুল বেঁধে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দিত। তার পর সব চুকে গেলে তার ভাগ্যে দিদির এঁটোপাতে খাবার জুটত—খুবই অনাগ্রহের সঙ্গে, নিতান্ত গলগ্রহের মত।

কত দিন মালা আড়ালে আপন মনে কেঁদেছে খিদের জ্বালায়, দিদির প্রতি মায়ের এই অহেতুক টানের জন্যে। কেন—কেন মা দিদিকে আলাদা করে সব ভালো ভালো জিনিস খাওয়াবে? সে কি তবে মায়ের মেয়ে নয়—দিদির কেউ নয়?

ছোট্ট মালা ভেবেছে—শুধু ভেবেছে, কিন্তু কূলকিনারা পায় নি। মনে মনে একটা নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠেছে প্রতি দিন প্রত্যেকের প্রত্যেকটা ছোটখাটো ব্যবহারে।

এক-এক দিন মনে হয়েছে মালার, আহা যদি বাবা থাকত তার, তা হলে বোধ হয় এইরকম দুয়োরাণীর মত ব্যবহার করত না কেউ তার সঙ্গে!

কিন্তু বাবা—বাবা কোথায় তার? কত দিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছে বাবার বিষয়ে, মা শুধু বলেছে, বাবা নেই তার! বাবা নাকি

মারা গেছে তার জন্মের কয়েকমাস পরেই।

তা হলে দিদি প্রতি দিন সকালে ওই বড় অয়েলপেন্টিংটার সামনে দাঁড়িয়ে যাঁকে প্রণাম করে, নিজের হাতে ফুলের মালা পরিয়ে দেয়—সে কে? মাকে জিজ্ঞাসা করেছে—কোনও কথার জবাব পায় নি। অন্য প্রসঙ্গে মা চলে গিয়েছে প্রতি বারেই।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছে কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। দিদি এমনিতেই একটু গম্ভীর-প্রকৃতির—তার ওপরে তার কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল মালার প্রতি। মায়ের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে দিদির কাছে যাবার তার উপায়ও ছিল না।

দেখতে দেখতে মালার বয়স দশ বছর পার হয়ে গেল। দিদি চোদ্দয় পড়ল।

একদিন সকালে উঠে মালা শুনল, মা তাদের আত্মহত্যা করেছে।

আত্মহত্যা কি মালা তা আগে জানত না। সেদিনই প্রথম শুনল এবং চোখের সামনে দেখল—কিসের কি একটা বড়ি খেয়ে মা মরে পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখে গ্যাঁজলা ভাঙছে—সে এক বীভৎস মূর্তি। খুব সুখের যে সে-মৃত্যু নয় তা মায়ের অসীম যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে মালা মর্মে মর্মে বুঝতে পারল।

মেঝের ওপর মায়ের হিমশীতল দেহটা পড়েছিল, আর তার ঠিক পাশেই তার দিদি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিদির চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কিরকম এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে।

মালা কিন্তু পারল না নিজেকে সামলাতে। কেঁদে আছড়ে পড়ল মায়ের মৃত্যু-নীল হিমশীতল বুকখানার ওপরে।

আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল তাকে সেদিন মায়ের বুকের ওপর থেকে তার দিদি কুন্তলাই। ঘরের মধ্যে আরো লোক ছিল—মেয়ে-পুরুষ, কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই—সবাই যেন বাকরুদ্ধ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়।

কুন্তলা মালার চোখের জল তার স্কার্টের প্রান্তভাগ দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে বললে, ভয় নেই, আমি আছি, এসো আমার সঙ্গে।

স্কার্ট-পরা ছোট ছোট দুটি বেণী ঝোলানো দিদির মিষ্টি স্বরে মালা কেমন-যেন হয়ে গেল। সুড়সুড় করে তার পিছু পিছু ঘরের বাইরে চলে এলো।

দিদির অন্তরের পরিচয় পেয়ে সত্যিই সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল মালা। কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশি অবাক হলো মায়ের মৃত্যুর দিনকয়েক পরেই।

মায়ের মৃত্যু দিদির মধ্যে আনল আমূল পরিবর্তন। হঠাৎ যেন দিদি এক নতুন জগতের সন্ধান পেলো মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

আগেই কুন্তলা চর্চা করত নাচ-গানের। বোধ হয় সে বিষয়ে সে পারদর্শীও ছিল। বহু কাপ-মেডেল পেয়েছিল সে বহু আসরে নাচ-গান করে। এবার সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিল সেই নাচ-গানের মধ্যে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত্রি শুধু নাচ আর গান নিয়ে পড়ে রইল। বড় বড় ওস্তাদ আনিয়ে, নামকরা নামকরা নর্তকের নিখুঁত শিক্ষাপণার গুণে সে নিজেকে করে তুলল অচিরকাল-মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠা নর্তকী ও গাইয়ে।

মালাকে কিন্তু তার ছোঁয়াচ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল সে। সেই উদ্দেশ্যে ভর্তি করে দিল তাকে মেয়েদের এক মিশনারী স্কুলে ও তৎসংলগ্ন বোর্ডিংহাউসে। বছরে মাত্র দু বার বাড়িতে আসবার অনুমতি ছিল মালার। কিন্তু সে সুযোগও গ্রহণ করতে দিত না তাকে কুন্তলা। সে-ই ছুটির কটা দিন সেখানে গিয়ে পৃথক বাড়ি নিয়ে বা হোটেলে কাটিয়ে আসত।

এইভাবে চলছিল। চললও বেশ কয়েকটা বছর। বছর সাত কেটে গেল দেখতে দেখতে।

কুন্তলা একুশ বছরে পা দিল। ওদিকে মালাও সতেরো বছর পার হলো।

কুন্তলা আর তখন কুন্তলা নেই—সে তখন কুন্তীবাঈয়ে পরিণত হয়েছে। ঘরে-বাইরে সবাইয়ের মুখে মুখে তখন রূপসী নর্তকী কুন্তীবাঈ—কিন্নরকণ্ঠী কুন্তীবাঈয়ের নাম। কাগজে কাগজে অপরূপ ভঙ্গিমায় কুন্তীবাঈয়ের নাচের চোখ-ঝলসানো ছবি। তরুণদের ধ্যান-জ্ঞান-জপ হয়ে দাঁড়িয়েছে

তখন কুন্তীবাঈ।

এইসময়ে একটা ছুটিতে মালা দিদিকে চিঠি লিখল, এবার স্কুল বন্ধ হলে সে কলকাতায় গিয়ে তাদের বাড়িতে দিদির সঙ্গে ছুটির কটা দিন কাটাবে।

ভীষণ আবদার জানিয়ে চিঠি লিখল কুন্তলাকে সে। সে-আশায় তার বাদ সাধতে পারল না কুন্তলা। সম্মতি জানিয়ে সেই দিনেই ফেরত-ডাকে চিঠি লিখে দিল সে।

অবশ্য এই সম্মতির মূলে, মালার কলকাতায় আসার ব্যাপারে, কুন্তলার এতখানি উদারতার কারণ ছিল। সম্প্রতি একটা খেয়ালে পেয়ে বসেছে তাকে।...বিয়ে করার প্রচণ্ড শখ হয়েছে তার।

তার বিবাহোৎসবে মালাকে নিয়ে আসবে কিনা যখন চিন্তা করছিল মনে মনে, সেই পরমক্ষণে এলো মালার আবদার-মেশানো চিঠি, আর তারই উত্তরে সে মত না দিয়ে পারল না।

মালা এলো।

বাড়িতে তখন মহা-মহোৎসব। মালা এ-সবের কিছুই জানত না।

সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বাড়ির অপরূপ অঙ্গসজ্জা আর সমারোহ দেখে। কয়েক মুহূর্ত লাগল তার নিজেকে সামলাতে।

শুধু যে দিদির বিয়ে উপলক্ষে আড়ম্বর আর সমারোহ তা নয়, বাড়ির পুরো আবহাওয়াটাই যেন পালটে গিয়েছে। মালা তার ছোট্ট বয়সে যে ঘুমন্ত পুরীকে পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছিল, এ যেন সে পুরী নয়। দিকে দিকে শুধু আলোর রোশনাই, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, লোকজনের আনাগোনা, নাচ-গান, হাসি-হল্লা।

কত মধুকর-মধুকরীর দল যে প্রত্যহ আসে এই জীবন্ত পুরীতে তাদের জীবনের কয়েকটা মুহূর্তকে মোহময় করে তুলতে তার ইয়ত্তা নেই। কত লোক প্রত্যহ আসে যায়—আর তাদের সকলের ওপরে সম্রাজ্ঞীর মত বিরাজ করে কুন্তলা—কুন্তীবাঈ—তার দিদি।

দিদিকে যেন আরো সুন্দর আরো সুশ্রী লাগে মালার। হঠাৎ যেন ক-মাসের মধ্যে সে আরো সুন্দরী হয়ে পড়েছে। দিদিকে দেখে দেখে আর দেখে সে—আশ মেটে না যেন আর।

এর মধ্যে একদিন দেখল সুব্রতকে—তার জামাইবাবুকে। ভালোই লাগল তার। দৃঢ়তাব্যঞ্জক পুরুষের মত চেহারা। দীর্ঘাকৃতি। সুশ্রী। বয়স ত্রিশের মধ্যেই। শুনল গভর্নমেণ্টের কোন্ দপ্তরে নাকি অফিসারের পদে চাকরি করে। আরো শুনল, বড়লোকের ছেলে, বাপের প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছে—সম্প্রতি বাপ মারা যাওয়ার পরে।

দিদির সৌভাগ্যে মালা কি মনে মনে ঈর্ষান্বিত হলো?

বিয়ে হয়ে গেল দিদির।

কিন্তু একটা সন্দেহ জাগল মালার মনে। এ বিয়েতে দিদি কি সুখী হলো না? কই সে-রকম হাসি খুশি তো তাকে দেখাচ্ছে না! বরং জামাইবাবুকে বাদ দিয়ে দিদি তার নাচ-গানের আসরেই যেন বেশি মশগুল থাকতে ভালোবাসে।

কেন? কেন? কেন?

ভাবে—কিন্তু ভেবে কোন কূলকিনারা পায় না মালা।

দিদি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করল, তবে কেন সে এ-বিয়েতে সুখী হতে পারল না? যদি সুখী হতে না পারবে, যদি পছন্দই না হবে, তবে কেন এই বিয়েতে মত দিল সে? শুনেছে সে, দিদির চারপাশে নিত্য-নিয়ত কত কত ঢের ঢের বেশি আকর্ষণীয় যুবকের দল ঘুরে বেরিয়েছে তার সামান্য সম্মতির অপেক্ষায়, কিন্তু দিদি কেন তবে পছন্দ করল তার জীবনের অংশীদার হিসেবে সুব্রতকে—যদি সে মন-প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোই না বাসতে পারবে?

তবে কি সুব্রতর টাকা তাকে আকর্ষণ করল এই কাজ করতে? কিন্তু মন সায় দেয় না মালার সেই যুক্তিতে। টাকা দিদির নিজেরই আছে যথেষ্ট—বলতে গেলে ছাতা পড়ছে তাতে। দু হাতে সে নিজে রোজগার করছে—তা ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছে প্রচুর।…

হঠাৎ মালার সেই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ছোট বয়সের বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটা ঘটনা।…দিদির পৈতৃক-সূত্রে পাওয়া প্রচুর টাকার কাহিনী… মায়ের ভয়-ভয় আতঙ্কিত ভাব…তার প্রতি বাড়ির সকলের অনাদর!

কি সেই কারণ?…কেন দিদি তখন সম্রাজ্ঞীর সমান সমাদর পেত সকলের কাছ থেকে? কেন সে তার ছোট বোন হয়েও হেনস্থা অর্জন

করেছে—কারো কাছ থেকে এক দিনের এক মুহূর্তের জন্যেও মিষ্টি কথা শুনতে পায় নি?

মালার সৌভাগ্যক্রমে সে রহস্যের সন্ধান সে লাভ করল ঠিক তার পরের দিনেই আকস্মিকভাবে।

মালা নিজেকে সেদিন বড়ই একলা একলা বোধ করছিল। এক-এক সময়ে ভাবছিল, ফিরেই যাবে নাকি আবার তার বোর্ডিং হাউসে? যদিও স্কুল খোলে নি, তবুও বোর্ডিং-এর দরজা খোলা আছে—হয়তো সেখানে বন্ধুদের মধ্যে কাউকে পেলেও পেতে পারে।...

একক নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল দিদির বাধা-নিষেধে আরো। দিদি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল তাকে, সে যেন অহেতুক উৎসাহী হয়ে কখনও কোন দিন শিশমহলের দিকে না পা বাড়ায় বা তার কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাবার চেষ্টা না করে। তা হলে সেই মুহূর্তে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বোর্ডিংয়ে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রোজকার মত নিজের ঘরে চলে এলো মালা। একখানা বই টেনে নিয়ে বিছানায় গা-টা এলিয়ে দিল। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন বসাতে পারল না—নানান্ চিন্তায় মনটা তখন খুবই ভার-ভার হয়ে উঠেছে। বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও গুটি-গুটি পায়ে এগুলো সামনের দিকে। কিসের এক অমোঘ আকর্ষণে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

এক বৃদ্ধা অথর্ব পিসী তাদের গলগ্রহ হয়ে আছেন বলে শুনেছে মালা, কিন্তু কখনও দেখে নি তাঁকে। সে পিসীও যেমন সামনে বেরিয়ে এসে নিজেকে কখনও প্রকাশ করেন নি, তেমনই কুন্তলা বা মালা কেউই কোন দিন তাঁর খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করত না। নিতান্ত নির্বিকারভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে তিনি পাঁচজনের চোখের আড়ালে বাড়ির একপ্রান্তে পড়ে থাকতেন। দোষটা মায়ের, মনে মনে ভাবে মালা, কোনও দিন সে পিসীকে সুনজরে দেখে নি, সেজন্যে মেয়েদেরও তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিত না।

সেই পিসীরই ঘরের সামনে আকস্মিকভাবে গিয়ে পড়ল মালা ঘুরতে ঘুরতে। তিনি তখন তাঁর ঘরের সামনে ছোট্ট একফালি বারান্দায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। চোখে ভালো দেখতে পান না—একেবারে

সামনে গিয়ে পড়লে অতি ঝাপ্‌সা ভাবে ঠাওর করতে পারেন শুধু। মাথার চুল সব শাদা হয়ে গিয়েছে শোণের মত। দাঁতের অস্তিত্ব নেই একেবারেই। কিন্তু সেই বয়সেও টক্‌টক করছে গায়ের রং। একবার দেখলেই বোঝা যায় এককালে সত্যিই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা ছিলেন তিনি।

মালাকে আচমকা তাঁর সামনে এসে ইতস্তত করতে দেখে চোখের ওপর একটা হাত তুলে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে উঠলেন পিসীমা প্রভাসুন্দরী দেবী, কে গা বাছা! কাকে চাই?

যদিও মালা কনভেণ্ট-পড়া উচ্চশিক্ষিতা, তবুও দিদির বাড়িতে এসে সে যেন কিরকম একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। সেটা অনেকটা কুন্তলার কঠিন বাধা-নিষেধের দরুণই বোধ হয়। তাই একটু থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললে সে, না আমি মালা—এই এদিকে একটু এসেছিলুম···

তা বেশ তো, অত কিন্তু-কিন্তু হচ্ছ কেন—এদিকে এসো!

মালা বোধ হয় বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে সাহস সঞ্চয় করতে পারল ভেতরে ভেতরে—পা-পা করে এগিয়ে গেল তাঁর আরো কাছে।

প্রভাসুন্দরী তাঁর দন্তবিহীন মাড়ীটা বার করে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, তুমি বুঝি সেই কেষ্টার মেয়ে···তা বেশ তো ডাগর-ডোগর হয়েছ দেখছি!

মালার ভ্রূদ্বয় আপনা থেকে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনই কিছু না বলে অপেক্ষা করে আরো কিছু শোনবার আশায়।

একটু পরেই তার সে আশা সফল হলো। প্রভাসুন্দরী আবার শুরু করলেন, কুন্তী যত্ন-আত্তি করে কেমন? ভালোবাসে না দূর-ছাই করে? ও-ও আবার তার বাপের মত একরোখা আর ফুর্তিবাজ কিনা!

এবার মালা একটু একটু করে বিস্মিত হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু সে-ভাবটা যতদূর সম্ভব গোপন করে সহজ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল, কেন দিদি তো আমায় খুব ভালোবাসে। আমাকে সুখী করবার জন্যে সবরকম ভাবে চেষ্টা করে দিদি!

থাম্‌ থাম্‌, অত করে আর বলবার দরকার নেই,—গর গর করে ওঠেন প্রভাসুন্দরী, আমার তো আর জানতে বাকি নেই তার গুণের কথা! বলি অত ডগমগ করছিস্‌ যার বিষয়ে, সে যদি তবু তোর নিজের

বোন হতো।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে মালার চোখ। কণ্ঠেও বুঝি সেটা চাপা থাকে না, দ্রুত বলে ওঠে, কে বললে আমার বোন নয়? মা বলেছে, ও আমার বড় বোন!

তাঁর কথার ওপরে কথা—এত বড় হিম্মৎ এ বাড়িতে কারুর নেই। তাই প্রভাসুন্দরী যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মালার চ্যালেঞ্জে, মুখটাকে বেঁকিয়ে ঠোঁট উল্টে সগর্জনে হেঁকে উঠলেন, থাম্ থাম্—বোন না হাতি! আমার চেয়ে তুই বেশী জানিস? তোর মায়ের কীর্তির কথা কে না জানে?

মালার কান-মাথা সব ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। তার মায়ের কীর্তি! কি সে? তবে কি কোন নোংরামি আছে? সেই জন্যেই কি মা অত ভয়ে ভয়ে থাকত? কিন্তু কি তা? পিসীমার কথায় পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গেল কোন কিছু অঘটনের—কিন্তু কি হতে পারে তা?

মালা নিজেকে আর সামলাতে পারল না। প্রভাসুন্দরীর সামনে তখনও দাঁড়িয়েছিল সে, ছুটে গিয়ে তাঁকে দু হাতে জাপটে ধরে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল, বলুন, বলুন আমাকে, আমি কে? কী বলতে বলতে থেমে গেলেন? মায়ের বিষয়ে কি বলছিলেন—চুপ করে থাকবেন না, বলুন, বলুন আমাকে, আপনার দুটো পায়ে পড়ি সব বলুন আমাকে।

অত্যন্ত গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠল প্রভাসুন্দরীর মুখখানা, স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে মৃদু স্বরে শুরু করলেন, তোর বাবার কথা মা তোকে কিছু বলেছিল? কি নাম তার বলে গিয়েছে?

না, কিছু বলে যায় নি। শুধু জানি বাবা আমার জন্মের কয়েক মাস পরেই মারা যান।

তোর বাবার নাম জানিস না?

হ্যাঁ—ভয়ে ভয়ে মালা উচ্চরণ করল, অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

মিথ্যে কথা। কে বলেছে তোকে এ নাম?

মুখখানা শুকিয়ে উঠল মালার। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে বললে, আমাকে হোস্টেলে ভর্তি করবার সময় দিদি এই নামই লিখে দিয়েছিল এ্যাডমিশান ফরমে।

কি আর করবে, সত্যি পরিচয় লিখলে তো আর তোকে নেবে না তারা!

মালা আপ্রাণ চেষ্টা করে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করবার। তার পর কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যাবার পর অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কে আমার বাবা? কি নাম তার?

কেষ্টা—কেষ্টা—এই বাড়িরই চাকর ছিল সে। অমরার খাস চাকর ছিল হতভাগা।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় মালা ততখানি বিমূঢ় হয়ে পড়ত না যতখানি হয়ে পড়ল কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসে তার।

এবার বহুক্ষণ সময় লাগল মালার নিজেকে সামলে নিতে। অবশেষে এক সময় পাংশু মুখে আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়—কোথায় সে···

তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছে অমরা। তোর মাকেও ফেলত—শুধু লোক জানাজানির ভয়ে আর আমার অনুরোধে করে নি তা।

লজ্জায়-ঘেন্নায় মালার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে জারজ সন্তান—তার মায়ের লালসার ফল! ছি ছি! এর চেয়ে তাকে কেউ তার জন্ম-মুহূর্তে গলা টিপে মেরে ফেলল না কেন? এই ঘৃণিত লজ্জাকর পরিচয়হীন জীবন নিয়ে সে বেঁচে থাকবে কি করে?

হু-হু করে ওঠে মালার সমস্ত অন্তরটা। প্রথমে জ্বালা—তার পর দুকূল ছাপিয়ে অশ্রুর মালা নেমে এসে বক্ষবাস ভিজিয়ে দিতে থাকে তার।

কঠিন-হৃদয়া প্রভাসুন্দরীর মনের কোণায় বোধ হয় মালার চোখের জল দেখে একটু করুণার উদয় হলো। মুখ-ভাবটাকে যতদূর সম্ভব নরম করে বললেন তিনি, মা-মাগী তোর মরে ভালোই করেছে। কুন্তীর মন যুগিয়ে চল্, তোর একটা হিল্লে করে দিয়ে যাবে সে নিশ্চয়ই।···কিন্তু খবরদার, তার মতের বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করিস নি, তাতে তোরই মন্দ হবে। এখন সম্পত্তি টাকা-পয়সা সবই তো তার নামে—তার বাবাই সে-রকম উইল করে গিয়েছে। দয়া হলে হয়তো তার কাছ থেকে কিছু পেয়েও যেতে পারিস। হাজার হোক, এক মায়ের পেটের বোন তো—তোকে একেবারে উড়িয়ে দেবে না।

মালা তখনও কেঁদে চলেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু একটানা নিবিড় ক্রন্দন। সমস্ত শরীরটা তার ফুলে ফুলে উঠছে।

প্রভাসুন্দরীর মুখে এবার একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠল। উদ্বেগাকুল কণ্ঠে ব্যস্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, আর কাঁদিস নি বাছা। কেঁদে কোন ফল হবে না। চুপ কর্। না হলে তুইও মরবি—আমিও রেহাই পাব না। বাপের বেটী সে—শিরায় শিরায় তার বাপেরই উদ্দাম জমিদারী রক্ত বইছে। দুজনকেই সাফ করে দেবে এক সঙ্গে তার বাপের কলঙ্ক ঢাকবার জন্যে। যে-কথা মাত্র দুটি প্রাণী ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না, সে-কথা তৃতীয় ব্যক্তির কানে উঠেছে জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না সে ছুঁড়ি।

শিউরে উঠল মালা অন্তরে অন্তরে। তার পরই কি ভাবল কে জানে—দাঁড়িয়ে উঠে কোনও দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল প্রভাসুন্দরীর সামনে থেকে।

ঠিক করল মালা সে হোস্টেলেই ফিরে যাবে। তার পর যে-করে হোক একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে বাকি কটা দিন ঠিক চালিয়ে নেবে। আর জীবনে সে এ-বাড়িমুখো হবে না। যেখানে তার কোন অধিকার নেই, কোন সম্পর্ক নেই—সেখানে সে ফিরে আসবে কিসের জোরে? কোন্ মুখেই বা আবার সে কুন্তলার সামনে দাঁড়াবে? না—না, কুন্তলা তার কেউ নয়। হলোই বা সে একই মায়ের পেটের বড় বোন, তবুও ওর যে পরিচয় আছে, তার তা নেই। তার জন্ম লালসার পঙ্ককুণ্ডে—আর কুন্তলা লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

মালা সেদিন রাত্তিরেই হোস্টেলে ফিরে যাবার জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে যখন কুন্তলার সামনে এসে দাঁড়াল, অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে কুন্তলা প্রশ্ন করলে, সে কি রে, কোথায় চললি?

আমি হোস্টেলে ফিরব—আজই, এখনই।

কেন, এত তাড়া কিসের, তোর স্কুল খুলতে তো এখনো দিন সাতেক বাকি।

হ্যাঁ, তা আছে, তবে আমার আর ভালো লাগছে না এখানে। আমি

আজই চলে যেতে চাই।

ছেলেমানুষি করিস নি। আমার জন্মদিন সামনে—সেটা কেটে যাক্, তার পরে ফিরে যাস্।

না দিদি, তুমি 'না' বলো না। তোমার জন্মদিনের এখনও সতেরো দিন বাকি—আমি অত দিন পর্যন্ত স্কুল কামাই করতে পারব না। বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে তা হলে আমার।

সে আমি বুঝবখন। তোমার যাওয়া এখন হবে না—এইটুকুই শুনে রাখো। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে যায় সেখান থেকে কুন্তলা।

বিস্ময়-বিমূঢ় মালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কুন্তলার গমনপথের দিকে তাকিয়ে।

এর পর দেখতে দেখতে আরো আট দিন কেটে গেল।

মালার স্কুল খুলে গিয়েছে। সে ছটফট করেছে হোস্টেলে ফিরে যাবার জন্যে, কিন্তু কুন্তলার দৃঢ় আপত্তিতে বার বার তাকে পেছিয়ে আসতে হয়েছে। কুন্তলার সেই এক ওজর—তার জন্মদিন কেটে না গেলে মালা ছুটি পাবে না।

তার পর এলো সেই দিন—যে-দিনের কথা মালা তার সারা জীবনে ভুলতে পারবে না। ঠিক জন্মদিনের চার দিন আগের ঘটনা।

মালা তার পুরনো আর্জি নিয়ে আবার কুন্তলার ঘরে ঢুকেছে, কিন্তু গতি তার স্তব্ধ হয়ে গেল আকস্মিকভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে। প্রবলভাবে চমকে উঠল সে সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে।

কুন্তলা তার মূল্যবান মেহগনি টেবিলের সামনে পুশ্‌ড্‌-ব্যাক চেয়ারটার ওপর বসে হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে মাথাটা তারই ওপর ন্যস্ত করে অঝোরঝরে কাঁদছে। কান্নার বেগে সমস্ত দেহ তার ফুলে ফুলে উঠছে।

মালা অবাক হয়ে যায়। তার এতখানি বয়স পর্যন্ত একদিনের জন্যেও এর আগে কুন্তলাকে সে কাঁদতে দেখে নি। আর সে-কান্না স্বাভাবিক কান্না নয়—মর্মান্তিক আঘাতে ভেঙে-পড়া তীব্র-আকুতিতে ভরা সে কান্না।...ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল মালা। ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠল, দিদি, দিদি, কাঁদছ কেন অমন করে? কি হয়েছে তোমার?

মালার সাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে খাড়া হয়ে উঠল কুন্তলা। তার পর মালার ছল-ছল চোখের দিকে তাকিয়ে কান্না-জড়ানো স্বরে বলে উঠল, না, না, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি ও-রকম ভাবে তাকিও না আমার দিকে—ও কিছু নয়, ও কিছু নয়!

মালার মনে হলো, কুন্তলা প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে সামলে নিতে। মুখের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে যেন চেষ্টাও করল ম্লান একটু হাসি হাসবার, কিন্তু পারল না—চোখের পলকের মধ্যে উঠে পড়ে ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বিস্ময়ে মালার যেন দম বন্ধ হয়ে আসবার মত উপক্রম হয়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে কুন্তলার ওইভাবে পালিয়ে যাওয়ার দিকে।

পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল ও ঘরের ভেতরে আরো খানিকটা ঢুকে টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল মালা। কৌতূহলী দৃষ্টি সর্বাগ্রে গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর রাখা ব্লু রংয়ের একখানা রাইটিং প্যাডের ওপর। ঝুঁকে পড়ে সেটা দেখতে গিয়েই আবার বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল একটা।··· কুন্তলা চিঠি লিখছিল? তাকে? তাকে সম্বোধন করে চিঠি? কি আশ্চর্য!

ছোঁ মেরে চিঠিটা তুলে নিল মালা টেবিলের ওপর থেকে।···কুন্তলার লেখা বটে! তার অভ্যস্ত গোটা গোটা অক্ষরে হেলিয়ে হেলিয়ে লেখা:

স্নেহের মালা,

খুব অবাক হয়ে যাবে এই চিঠিটা যখন পাবে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে; সুতরাং তুমি আশ্চর্য হলেও আমি আশ্চর্য হচ্ছি না একেবারেই।

প্রথমেই দরকারী কথাগুলো সেরে নি। আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, ব্যাঙ্কের নগদ টাকাকড়িপত্তর সব আমি তোমার নামে উইল করে দিয়ে গেলাম। তুমি উনিশ বছরে পড়লে তবে সে সম্পত্তি ও টাকাপয়সার দখল পাবে।

এবার আমার কতকগুলো জিনিসের বিলি-বন্দোবস্ত করবার ভার এই চিঠি মারফৎ তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। সেগুলো যাতে যথাস্থানে ঠিক ঠিক লোকের হাতে পেঁছয় সেদিকে নজর রেখো।

তোমার জামাইবাবু সুব্রতকে তার দেওয়া গয়নাগুলো সব ফেরত দেবে। সেগুলো আমার বড় সিন্দুকটার মধ্যে জয়পুরী-কাজ-করা একটা বাক্সের মধ্যে আছে দেখতে পাবে। জয়পুরী-কাজ-করা বাক্সটাও তার। সেটা সুদ্ধ সব গয়নাগুলোই যাতে মালিকের জিম্মায় ঠিকভাবে ফেরত যায় সেদিকে নজর রাখবে।

মানদাকে আমার একটা ভালো দিশী শাড়ি দেবে, আর পাঁচ শ টাকা দেবে। টাকা সিন্দুকের মধ্যেই থাকবে।

ভরতকে এক হাজার টাকা দেবে। সে টাকাও তার নামে একটা খামের ভেতরে পুরে সিন্দুকের মধ্যে রেখে গেলাম। এছাড়া আমার শোবার ঘরের টাইমপিসটা তাকে দিও। সে বরাবর ওটার প্রশংসা করে এসে............

ওইখানেই থেমে গিয়েছে কলম, কাগজটার ওপর একটা আঁচড় রেখে। দেখলেই যেন মনে হয় কলমটা আপনা হতে হাত থেকে খসে পড়ে যায় কুন্তলার—উদ্গত অশ্রুর উদ্দাম গতিবেগকে রোধ করতে।

পাথরে পরিণত হয়ে যায় মালা। এর মানে কি? দিদি কি মরতে যাচ্ছিল?...সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল বটে—কিন্তু এখন তো সম্পূর্ণ সুস্থ! আর তা ছাড়া ফ্লুতে লোক মরে না—দিদির অন্তত সেরকম ফ্লু হয় নি, যাতে মৃত্যু ঘটতে পারে। একটু যা দুর্বল, এ ছাড়া তার তো আর কোন গোলমাল ছিল না শরীরে! তবে এ চিঠি কেন সে লিখতে বসল?

মালা আবার চিঠিখানা মেলে ধরল। আর একবার চিঠিটা পড়ে ফেলল আদ্যোপান্ত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটার মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল চিঠির একটা বিশেষ অংশের প্রতি নজর পরতে—'আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যাঙ্কের নগদ টাকাকড়িপত্তর সব আমি তোমার নামে উইল করে দিয়ে গেলাম'......

দিদি তাকে তার সমস্ত টাকা দিয়ে গেল! কেন? তার স্বামী রয়েছে—তা সত্ত্বেও সব টাকা উইল করে তাকে দিয়ে যাবার কারণ কি? সাধারণত স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামীই সব টাকাকড়ির মালিক হয়ে থাকে, তারই ন্যায্যতঃ প্রাপ্য সব, আর তাকেই কিনা বঞ্চিত করে সব দিয়ে গেল এইভাবে অন্য আর-এক জনকে, যার পাওয়া উচিত নয়, যে এক কপর্দকও

পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কী বিচিত্র!

মালা ভাবে, দিদির কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? জ্বর আক্রমণে এরকম বেসামাল হয়ে পড়তে কাউকেও তো সে শোনে নি এ পর্যন্ত! এক মাত্র কারণ যা সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে—ক'দিন আগে একটু বাড়াবাড়ি ধরণের জ্বর আক্রমণ হয়েছিল তার ওপর। কিন্তু তাও তো বড় জোর এক সপ্তাহের ভোগান্তি! এই সামান্য কারণে মনের এমন কি পরিবর্তন আসতে পারে, যা এক বিচিত্র উইল রচনায় তাকে প্রবুদ্ধ করল!

আরো কয়েক মিনিট ইতস্তত করবার পর মালা চিঠিখানা টেবিলটার একটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।...কে জানে, চাকরদের চোখে পড়লে তারা আবার অন্যরকম মানে করতে পারে এই চিঠির!

সেই চিঠি সেইখানেই পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল সেদিনের সেই সাংঘাতিক জন্মদিনের পার্টির পরেও। কুন্তলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ হিসেবে সেটার যথেষ্ট প্রয়োজন-বোধও অনুভূত হয়েছিল সেদিনে। কুন্তলার মৃত্যু যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সেটা যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না—তা সপ্রমাণ করতে ওই চিঠিটা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।...বিশেষ করে করোনারের আদালতে মৃত্যুর যে কারণ সরকার-পক্ষ থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর নৈরাশ্য-জনিত অবস্থা থেকে আত্মহত্যার প্রতি প্রবণতা—সেটা সপ্রমাণিত করে দেয় ওই চিঠির অবতারণা।

মালা নিজেও আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে সেদিন ওই কারণই দর্শিয়েছিল। যদিও মনে মনে মালার সেটা অনুমোদন লাভ করে নি আদৌ, তবুও ওটাই একমাত্র সম্ভাব্য কারণ বলে গ্রহণ না করে উপায় ছিল না।

সুব্রতও তাই করেছিল। সেও ওই কারণটাকেই সেদিন মৃত্যুর একমাত্র কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল মনে মনে।

তার পর, মৃত্যুর সাত মাস পরে, আকস্মিকভাবে যে-বস্তু মালার হাতের মধ্যে এসে পড়ল, সেটা তাঁর পূর্ব ধারণাকে খানিকটা বদলে দিল বৈকি!

মালা অনুশোচনা করে মনে মনে, সে কি সত্যিই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিন, না হলে তার পক্ষে ওই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছিল কি করে? কুন্তলা—কুন্তীবাঈ—তার বিচিত্র জীবন…সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি, সে বোধ তার মধ্যে আসে নি কেন সেদিন?

দীর্ঘ সাত মাস পরের ঘটনা।

মালা নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কুন্তলার স্মৃতি তার মানসপট থেকে আস্তে আস্তে মুছে আসছে।

সম্পত্তির দখল সে এখনও পায় নি, কারণ উনিশ বছরে পড়তে এখনো বেশ দেরি আছে। তবে মাসোয়ারা পাচ্ছে সে নিয়মিতভাবে উইলের ব্যবস্থানুযায়ী।

আরো একটা ব্যবস্থা রয়েছে উইলের মধ্যে। কুন্তলার স্বামী সুব্রত, যদি ইচ্ছে করে, সে তার স্ত্রীর অবর্তমানে তার বাড়িতেই জীবিত কাল পর্যন্ত থাকতে পারবে ও গ্রাসাচ্ছাদনের যাবতীয় খরচা সব স্টেট থেকেই পাবে।

সেই ব্যবস্থানুযায়ী সুব্রত শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেল অর্থাৎ সে আর নিজের বাড়িতে ফিরে গেল না, যদিও তার অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল ছিল এবং তার হাতে পিতৃদত্ত প্রচুর টাকাও ছিল।

মালা এ ব্যাপারে আপত্তি করে নি। কারণ অত বড় বাড়িতে একলা থাকতে তার একটু ভয়-ভয় করেছিল। যদি একজন পুরুষমানুষকে পাওয়া যায়, তা হলে সেটা আর থাকে না। তা ছাড়া জামাইবাবু লোকটাকে তার মোটামুটি ভালোই লেগেছিল। নিরীহ আমোদপ্রিয় আর নির্ঝঞ্ঝাটে ওই লোকটিকে সর্বদা পাশে পাশে রাখতে সে পছন্দও করত।

সুব্রতর অন্তকরণ ছিল শিশুর মত নরম। কখনও কারো বিরুদ্ধে লাগা বা কাউকে বকা-ঝকা করতে পারত না সে একেবারেই। কারো দুঃখ দেখলে বা কাউকে কষ্ট পেতে দেখলেও সে অস্থির হয়ে উঠত—ছটফট করে নিজেকে অসুস্থ করে তুলত, যতক্ষণ না সেই লোকের দুঃখভার লাঘব করতে পারত।

মালার প্রবল অনিচ্ছা সত্বেও তাই তাকে রাজী হতে হলো বৃদ্ধা প্রভাসুন্দরীকে বাড়িতে রাখতে। সুব্রত নাছোড়বান্দা হয়েই মালাকে সে প্রস্তাবে সম্মত করাল। কারণ বুড়ীর অবস্থা সত্যিই সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল তার এক অকালকুষ্মাণ্ড ছেলের জন্যে। ছোটবেলা থেকে মায়ের অত্যধিক আদরে সে আর মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি। লেখাপড়া তো শেখেই নি একেবারে, তদুপরি বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যতরকমের বদ্ অভ্যাস সব আয়ত্ত করেছিল। প্রভাসুন্দরীর হাতে নগদ টাকা-কড়ি যা ছিল সে সব তো শেষ করে দিয়েই ছিল ওই ছেলে, তা ছাড়া সম্পত্তি যা সামান্য কিছু ছিল, সেসবও উড়িয়ে দিয়েছিল। বাধ্য হয়েই প্রভাসুন্দরীকে পরের আশ্রয়ে এসে মাথা নীচু করে তাদেরই অন্নে দিন কাটাতে হচ্ছিল।

মালা যে-মুহূর্ত থেকে বাড়ির মালিক ও সম্পত্তির ওয়ারিশন হয়ে বসল, সে-মুহূর্ত থেকে প্রভাসুন্দরীও তার বশংবদ হয়ে গেলেন। আর সে প্রভাসুন্দরী নেই, যিনি একদিন মালাকে তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কথা শুনিয়েছিলেন। বরঞ্চ মালার মা ও বাবার সুখ্যাতিতে তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

মালা শুধু মুখ টিপে একটু হাসল মাত্র।

জীবন বেশ সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলছিল। সংসারের কোথাও কোন ফাটল নেই। কুন্তলার স্মৃতিও বাড়ির সকলে ভুলে আসছিল।

সুব্রত তার কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে মালা একা। কোন কাজকর্ম নেই। ভালোও লাগছিল না। তাই মালা হঠাৎ কি মনে করে গুটিগুটি পায়ে গিয়ে ঢুকল তেতালার একদিকে পরিত্যক্ত দরজা-জানালা বন্ধ ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে।

ঘরটা গুদামঘর বলেই শুনেছে সে। শুধু কতকগুলো অব্যবহৃত ট্রাঙ্ক সুটকেস আর ফার্নিচারের গুদামঘর। বাড়ির মালিক হওয়া অবধি এ পর্যন্ত মালা সে-ঘরে একদিনের জন্যেও ঢোকে নি।

প্রথমে ঘরখানার ভ্যাপসা গন্ধে পালিয়ে আসছিল সে, কিন্তু হঠাৎ এক কোণে স্তূপাকৃত একগাদা ট্রাঙ্ক-সুটকেসের মধ্যে একটা বেশ শৌখিন সুটকেশের ওপর নজর পড়তে আর ফিরে যাওয়া হলো না তার। তবুও ভাবল একবার মনে মনে, পরে দেখলেই চলবে, ভরত কিংবা মানদাকে

দিয়ে ওটাকে পাড়িয়ে আনিয়ে সময়মত একসময়ে দেখবে—এখন ওই ধুলোর মধ্যে ঢুকে লাভ নেই। কিন্তু মন না চাইলেও পা দুখানা যথাস্থানে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে হাজির তরল। তার পর দুটো সুটকেসের তলায় রাখা সেই অভীপ্সিত সুদৃশ্য সুটকেসটাও ঠিক টেনে বার করল সে একাই।

সুটকেসটার ওপরে সোনালী হরফে 'কুন্তলা সেন' নামটা লেখা রয়েছে এবং তখনও পর্যন্ত সেটা ঝক্ ঝক্ করছে।

নামটার দিকে তাকিয়েই মালার বুকটা কেমন ধকধক করে উঠল। অতিরিক্ত উত্তেজনায় হাতটাও কাঁপতে লাগল মৃদু মৃদু ভাবে। কিন্তু তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। সুটকেসটা খোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু চাবি দেওয়া থাকায় কিছুতেই আর খুলতে পারছে না। অবশেষে সেটা ভেঙে ফেলবে মনস্থ করে ঘরখানায় ইতস্তত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতে লাগল লোহার একটা ছোট ডাণ্ডার জন্যে।

তার পর বহু আয়াসে বহু পরিশ্রমের পর যখন সেটা খুলতে পারল, গুম্ খেয়ে গেল সে ডালাটা তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই। এমন কিছু নেই ভেতরে যা আকর্ষণ করতে পারে। শুধু কতকগুলো সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ আর একটা ড্রেসিং-গাউন।

বিরক্ত হয়ে উঠল মালা নিজের ওপরেই। কি দরকার ছিল এত পরিশ্রম করবার? যে বস্তুগুলো বেরুলো সেগুলোর মূল্য অন্যের কাছে কিছু থাকলেও, মালার কাছে তার মূল্য এক কপর্দকও নয়। মিছিমিছি সে শুধু খেটেই মরল!

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শাড়িগুলো নাড়াচাড়া করে দেখল একবার মালা। তার পর সেগুলো একপাশে জড়ো করে রেখে ড্রেসিং-গাউনটা টেনে বার করল। সেটাও দেখে নিয়ে শাড়িগুলোর পাশে রাখতে গিয়ে হঠাৎ আবার টেনে নিল ও মেলে ধরল। তার পরেই ডান পাশের পকেটটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গোল করে পাকানো নীল রংয়ের কাগজ একটুকরো বার করে আনল।

গাউনটা রাখবার সময়ে খরখরে আওয়াজ শুনে ভেবেছিল মালা, বোধ হয় কোন কিছুর বিল বা বাজে কোন কাগজ দেখতে পাবে। কিন্তু সে-জায়গায় নীল রংয়ের চিঠির কাগজ দেখতে পেয়ে যেটুকু চমকে উঠেছিল, তার দ্বিগুণ চমকে উঠল চিঠিটা মেলে ধরে ও তার প্রথম কয়েক

ছুত্র পড়ে। তার পর যত এগোতে লাগল চিঠিখানার মধ্যে ততই যেন বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসবার মত উপক্রম হতে লাগল তার।

ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম,

তুমি যা ভেবেছ, তা হতে পারে না, হতে পারে না।...আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। আমরা দুজনে অভিন্ন।...আমিও যেমন জানি তা, তুমিও ঠিক তাই জানো। আমরা হঠাৎ এইভাবে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে পারি না পরস্পরকে ও নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে ফেলতে পারি না। তুমি ভালোভাবে জানো প্রিয়তম তা অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি এবং আমি চিরকাল যুগ-যুগান্তর ধরে অভিন্ন।... আমাকে একজন সাধারণ মেয়েছেলে বলে ভেবো না—লোকে কি বলে তাতে ভ্রূক্ষেপও করি না আমি। আমার কাছে ভালোবাসার মূল্য অনেকখানি।...আমরা দুজনে একত্রে বেরিয়ে পড়ব সব বাধা তুচ্ছ করে—সুখী হবো—তোমাকে সর্বতোভাবে সুখী করবার চেষ্টা করব।...তুমি আমাকে বলেছিলে একদিন যে, আমাকে ছাড়া তোমার জীবন ধুলো এবং ছাইয়ে পরিণত হয়ে যাবে—মনে পড়ে সে-কথা ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম? আর সেই তুমি কিনা এখন এমনি নির্লিপ্তভাবে লিখতে পারলে—আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে ভালো হয়—আর তা আমার পক্ষে মঙ্গলও।... আমার মঙ্গল? কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।... সুব্রতর জন্যে আমি দুঃখিত—বিশেষ করে তার আমার প্রতি গভীর ও আন্তরিক ভালোবাসার জন্যে—কিন্তু সেরকম পরিস্থিতিতে সে আমাকে ভুল বুঝবে না, প্রয়োজন হলে সে আমাকে মুক্ত করে দেবে নিশ্চয়ই। আর তা ছাড়া যদি আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারি, একসঙ্গে বাস করারও কোন মানে হয় না, আর তা উচিতও নয়।...ভগবান তোমাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের পরস্পরের জন্যে প্রিয়তম—আমি আমার অন্তর দিয়ে তা বুঝতে পারছি। আমরা দুজনে সত্যিসত্যিই চরম সুখী হবো।...কিন্তু সাহস চাই আমাদের। আমি সুব্রতকে নিজে সব কথা বুঝিয়ে বলব —সব ব্যাপার তার গোচরীভূত করে নিজেকে মুক্ত করে নেবো,

কিন্তু তা আমার জন্মদিনের আগে নয়।

আমি জানি আমি যা করছি ঠিকই করছি ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম এবং এও বুঝছি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না আমি।…দেখ, বোকার মত কি সব আবোলতাবোল লিখে বসলুম, যেখানে দু লাইনে সব ব্যাপারটা বলা চলত—শুধু 'আমি ভালোবাসি তোমাকে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না কোনদিনই'! প্রিয়তম……

আর লেখা নেই। চিঠিখানা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে।

মালা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে চিঠিখানার দিকে। নিজের আপনার জন সম্বন্ধেও ধারণা কত সীমাবদ্ধ হতে পারে মানুষের!

তা হলে কুন্তলার ভালোবাসার লোক ছিল—তাকে অধীর-কামনায়-ভরা প্রেমপত্র লিখছিল—তার সঙ্গে পালিয়ে যাবার কথাও মনে মনে ভাবছিল!

কিন্তু কি ঘটল শেষ পর্যন্ত? কুন্তলা নিশ্চয়ই পাঠায় নি এই চিঠি তার প্রেমাস্পদকে! কেন?

ব্যাঘ্ররাজ! কি অদ্ভুত নাম! ভালোবাসলে মানুষ কি এইরকমই হয়? এত সিলি? হাসল মালা।

লোকটা কে? কুন্তলার মত সেও কি তাকে ঠিক সেইরকম ভালোবাসত?

কিন্তু তাই বা না হবে কেন? কুন্তলার মত আকর্ষণ কটা মেয়ের মধ্যেই বা থাকে?

কিন্তু, তবু, কুন্তলার চিঠি অনুযায়ী, তার ব্যাঘ্ররাজ চেয়েছিল, তাদের মধ্যেকার ভালোবাসার ইতি করতে!

কেন? কুন্তলার ভালোর জন্যে?

সেটা তো পুরুষের মামুলী গৎ—নিজেদের আত্মরক্ষার একটা উপায় মাত্র!…আসলে লোকটা অসৎ। কুন্তলার ভালোবাসা আর তার ভালো লাগছিল না। বোধ হয় অন্য শিকারের সন্ধান পেয়েছিল।

কুন্তলাটা কি সরল! একবারও ভালোভাবে ভেবে দেখল না, কেন তার ব্যাঘ্ররাজ তাকে ছেড়ে দিতে চাইছে? কেন সে তার সঙ্গে সমস্ত

সম্পর্ক শেষ করে দিতে চাইছে?

কিন্তু লোকটা কে? কদিন ধরে যাদের সে কুন্তলার চারপাশে ঘুর-ঘুর করে গুঞ্জনধ্বনি তুলতে দেখল—তাদেরই মধ্যে কেউ?

কিছুতেই ভেবে পায় না মালা। ব্যাঘ্ররাজের উপযুক্ত চেহারার কোন লোকের কথা কিছুতে মনে আনতে পারে না সে।

তবে কি অজয় ভোস? তার সঙ্গে কুন্তলার একটু বেশি মাখামাখি কদিন দেখল বটে। মানদার মুখেও শুনেছে, কুন্তলা মাঝে মাঝে একলা অজয়ের সঙ্গে পাড়ি দিত অজানার উদ্দেশে—একাদিক্রমে দশ-পনেরো দিন কাটিয়ে ফিরে আসত আবার কলকাতায়। কোথায় যেত, কোথায় থাকত—তার কোন খবর জানাত না সে কাউকে।

কিন্তু অজয়কে দেখে পাগল হবার মত তো কোন কিছু নজরে পড়ে নি মালার! তবে কি দেখে মজেছিল দিদি?...একটা মধ্যবয়সী ঈষৎ স্থূলাকার লোক।...মুখখানা অবশ্য মন্দ নয়। আর ভালো তার পুরুষত্ব-ব্যঞ্জক চেহারাটা। কিন্তু তেমনি ঘরে স্ত্রী আছে, দুটো ছেলেমেয়ে আছে।

আরো শুনেছে মালা, অজয়ের ওই সুশ্রী-সুন্দর চেহারার জন্যে, তার পয়সার লোভে, অনেক মেয়েই এ পর্যন্ত তাকে আত্মদান করেছে। তার বউ অলকাও ভালোবেসে বিয়ে করে অজয়কে। লক্ষপতি ধনীর মেয়ে অলকা। বাপের অনিচ্ছাতে একরকম জোর করে অজয়কে পতিত্বে বরণ করে সে। বোধ হয় ওই চেহারার জন্যেই।...কুন্তলাও কি সেই ভুল করল? শুধু চেহারা আর মিষ্টি কথা শুনে সে মজল?

আর অজয় ভোস যদি না হয়, মনীশ লাহাড়ী নয় তো সেই লোক!

কিন্তু মালার ইচ্ছে হয় না, মনীশ লাহাড়ীকে ব্যাঘ্ররাজ বলে অনুমান করতে, মন চায় না তা। মনীশের মত সুদর্শন যুবককে ব্যাঘ্ররাজের আবরণে কল্পনা করতে মালার কষ্টই হয়।

যদিও মনীশ একেবারে ভেড়া না হোক, কাছাকাছি-প্রায় অনুগত ছিল কুন্তলার। কুন্তলার কোন কাজ করে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য-জ্ঞান করত সে। সর্বক্ষণ ছায়ার মত কুন্তলার পাশে পাশে ঘুরত।

কিন্তু মনীশের একটা আচরণ ভালো লাগে নি মালার। কেন সে ওভাবে পালিয়ে গেল—অদৃশ্য হয়ে গেল কুন্তলার জন্মদিনের উৎসব-পার্টির রাত থেকে? হয়তো তার মনে কুন্তলার প্রতি স্নেহের আধিক্যই এই

অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল, তা হলেও সেটা খুব দৃষ্টিকটু বলে ঠেকেছে সবার চোখে এবং তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।···

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে মালার হাতের চিঠিটার ওপর। সেটা আর-একবার পড়বার জন্যে যে-মুহূর্তে মেলে ধরেছে, মানদার আহ্বান শুনতে পেল সে দোতলা থেকে। আর পড়া হলো না, তাড়াতাড়ি ভাঁজ করে সেটা পুরে ফেলল ব্লাউজের মধ্যে। তার পর স্বাভাবিকভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার ওপরে শিকল তুলে দিয়ে নীচে নেমে এলো।

দিন দশেক পরের ঘটনা। মালা ব্যাঘ্ররাজের স্মৃতি ভুলে আসছিল প্রায়।

সেদিন নেমন্তন্ন ছিল বন্ধু নীতার বাড়িতে। তার ম্যারেজ-এনিভারসারি ডে। মালার ওপর ভার পড়েছিল উদ্বোধনী সংগীত গাইবার।

মালা চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারল না নীতার লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে। দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। সেজন্যে লজ্জিত হয়ে মুখখানা কাচুমাচু করে যখন পৌঁছল, ফুরসৎ আর পেল না কারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার—সোজা গিয়ে তাকে বসতে হলো অর্গানের সামনে।

রবীন্দ্র-সংগীতে মালার খুবই সুনাম ছিল। সেইজন্যে তার দেরিটুকু সে পুষিয়ে দিতে পারল কণ্ঠ দিয়ে। অজস্র হাততালি আর উচ্চ প্রশংসার মধ্যে শেষ করল সে তার উদ্বোধন গান।

ফিরে আসছিল মালা ডায়াস থেকে নীতার পাশাপাশি। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে যখন, হঠাৎ একটা সুমিষ্ট আহ্বানে ফিরে দাঁড়ালো ও বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল সে।

আমায় চিনতে পারলেন না মালা দেবী?

মালার মুখখানা প্রথমে কঠিন আকার ধারণ করেছিল। তার পরেই অপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে সেটা সামলে নিয়ে মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে, না, চিনতে কষ্ট হয় নি। বলুন, কি বলছেন!

হে-হে, না, কিছু বলি নি—আমায় দেখেও 'পাস' করে যাচ্ছিলেন···

মনীশ চোখের পলকে দুটো চেয়ার ডিঙিয়ে মালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

নীতা হেসে বললে, ওমা, তুই চিনিস্ নাকি মনীশদাকে!

হ্যাঁ, দেখেছি ওঁকে এর আগে। সংক্ষেপে উত্তর দিল মালা।

কোথায় রে? নীতার কণ্ঠে কৌতূহলের সুর।

দিদির বাড়িতে। মালা আরো সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

তা হলে তো তোর পরিচিত মনীশদা—বোস্ এখানে, কথা বল্ ওর সঙ্গে, আমি আসছি এখুনি। নীতা ব্যস্ত হয়ে চলে যায় সামনের দিকে।

মালা বিব্রত বোধ করে। জড়তা বা সংকোচ নেই বটে তার মধ্যে, কিন্তু আচমকা মনীশ লাহাড়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—এটা যেন তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

মনীশ সুযোগের অপব্যবহার করল না। স্মিতহাসিতে মুখখানা রঞ্জিত করে চাপা স্বরে বললে, সত্যি আমার নিজেরই হিংসে হচ্ছে নিজের ওপর, কি সৌভাগ্য, এখনও মনে রেখেছেন আমাকে!

অকারণে মালার গাল দুটো গোলাপী হয়ে ওঠে, কণ্ঠেও তার ছোঁয়াচ লাগে। তবুও যতটা সম্ভব নিরাসক্তভাবে বললে সে, আমার স্মৃতিশক্তি এখনও খারাপ হয় নি বলেই ধারণা আমার।'

ও নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সে-বদনাম আমার সামনে অন্তত আপনার নামে কেউ দিতে পারবে না।

শুনে বাধিত হলুম। হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে যায় মালা।

চলুন, ওপাশটায় গিয়ে কথাবার্তা বলা যাক্—অনেকদিন পরে দেখা হলো···

এ্যাঁ, ও হ্যাঁ, চলুন।

ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে ওঠে মনীশের, কিছু মনে করবেন না, হঠাৎ কি চিন্তা করছেন বলুন তো?

মালা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। চিন্তা তার একটাই—কুন্তলার সেই চিঠিতে লেখা 'ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম' কি এই লোকই?···মনীশ কুন্তলার প্রিয়তম—না বন্ধু?

কি হলো, কি ভাবছেন বললেন না তো?

ঢোক গিলে বললে মালা, না, ও অন্য একটা কথা।···চলুন, বসি গে!

মনীশও চিন্তামুক্ত ছিল না।···আবার মালার সঙ্গে যে দেখা হবে এ আশা তার সুদূর কল্পনার বাইরে ছিল। কুন্তলার জন্মদিনের পার্টিতে

ফুলের মত যে মেয়েটিকে দেখেছিল সে, তাকে আর-একবার দেখবার জন্যে, তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে ছটফট করেছে সে, কিন্তু সম্ভব হয় নি তা ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে। আজ সে সৌভাগ্য দেখা দিল অযাচিতভাবেই।

মালা ও মনীশ এগোচ্ছিল সামনের দিকে। হঠাৎ এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে টেনে নিয়ে গেল মালাকে অন্য আর-এক দিকে। মুখখানা শুকিয়ে গেল মনীশের। ম্লান হেসে মালাকে ঘাড় নেড়ে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা বলে সে ফিরে গিয়ে বসল আবার তার স্বস্থানে।

ফাংশন শেষ হলো রাত দশটায়। তার পর খাওয়া-দাওয়া চুকতে চুকতে এগারোটা বাজল।

মালা নীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠল—সওয়া-এগারোটা বেজে গিয়েছে। একটু ব্যস্ত হয়েই তাই সোফারকে আদেশ দিল তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে।

কাঁকরঢালা পথটা পার হয়ে ঠিক রাস্তায় পড়বার মুখে যেন আকাশ ফুঁড়ে মোটরের সামনে এসে দাঁড়ালো মনীশ। চমকে উঠল মালা অন্ধকারের মধ্যে।

আমায় একটা লিফ্ট্ দেবেন? একেবারে জানালার পাশে এসে অনুরোধ করলে মনীশ।

ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলেও বাইরে সেটা প্রকাশ না করে মালা বললে, কদ্দুর যাবেন?

বাড়ি যাব।

বাড়ি কোথায় আপনার?

আপনি আমাকে রাসবিহারী এভিনিউয়ের মুখে ছেড়ে দেবেন।

আচ্ছা, চলুন।

অনুমতি পেয়ে মনীশ যে একেবারে তার পাশে এসে বসবে এতখানি আশা করে নি মালা। তাই তার ধৃষ্টতা দেখে রাগ হলো যতখানি তার চারগুণ হলো বিস্মিত। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

মনীশই কথা বলল প্রথম, আপনি খুব রেগে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

খুব অস্বাভাবিক কি তা?

যদি অনুমতি করেন, নেমে যেতে পারি।

সংযত করে নিল মালা নিজেকে, নেমে যাবার কথা আমি বলি নি। মাপ করবেন, যদি কোন কিছু অন্যায় করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

মালার মনে হলো, মনীশ ক্রমশ যেন তার গা ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করছে। মালা ভাবে, লোকটা সত্যিই নির্লজ্জ, নাহলে তার কথায় আর কাজে এত পার্থক্য হয় কি করে!

একটু সরে বসল মালা।

পরমমুহূর্তে মনীশও সরে গিয়ে মালার গা ঘেঁষে বসল। শুধু তাই নয়, রাস্তার মোড়ে গাড়ি টার্ন নেবার মুখে এলিয়ে পড়ল মালার দেহের ওপরে।

একটা ঝট্‌কা মেরে মালা সরে গেল আরো বাঁদিকে।

মনীশ নিরীহ স্বরে বললে, সরি, লাগল আপনার?

তীক্ষ্ণচোখে একবার তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে মালা বললে, লাগলে আর করছি কি!

কোন্‌খানে লাগল?

মনীশের কণ্ঠস্বরে আর কথার ধরণে মালা না হেসে পারল না, বললে, ছেলেমানুষ!

সত্যি।

কি সত্যি?

ওই যে বললেন!

ইমপসিবল!...আপনার মত ভাঁড় সত্যিই আমি দেখি নি।

যা বলেছেন।

মালা গম্ভীর হয়ে যায়। চুপচাপ বসে থাকে বাইরের দিকে তাকিয়ে। মনীশের সঙ্গে সেই মুহূর্তে কথা বলতেও তার গা ঘিন-ঘিন করছিল।

ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

মনীশের আচমকা প্রশ্নে মালা ফিরে তাকাল তার দিকে।

কি ভাবছেন? মনীশ আবারও প্রশ্ন করল একগাল হেসে।

এত দিন ছিলেন কোথায়? আচমকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে বসে মালা।

এত দিন মানে?

মানে সেই সেদিন রাত থেকে! আপনার রহস্যজনক অন্তর্ধান দিদির

মৃত্যুর দিন রাত থেকে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করেছে সকলের মনে।

অপরাধ?

এমন কাচুমাচু মুখখানা করে মনীশ কথাটা বলল যে, এবারও মালা না হেসে পারল না। কিন্তু দ্রুত সে-হাসিটুকু সে গোপন করে বললে, সেদিন ওই একসিডেণ্টের পর আপনি একবারও এদিকে মাড়ালেন না— সেটাই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে না কি?

কি করব বলুন, আমি সত্যিই ছিলুম না—সুদূর ইউরোপে পাড়ি দিতে হয়েছিল।

ইউরোপে? হঠাৎ?

আমার কাজেই।

ফিরেছেন কবে?

দিন কয়েক আগে।...কিন্তু আমি আপনাদের সব খবরই রাখতুম।

তাই নাকি? কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বলে মালা।

বিশ্বাস করুন, আপনাকে ভুলতে পারি নি আমি সেই সেদিন রাত থেকে। আমার সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান হয়েছিলেন আপনি এই ক-মাস ধরে।

আবারও কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে মালার। মুখের ওপর একটা সলাজ ভাব নেমে আসে।

মনীশের দৃষ্টি এড়াল না এটুকু। মনে মনে সে আশান্বিতই হয়।

অকস্মাৎ সোফারকে গাড়ি থামাতে বলে নেমে পড়ল মনীশ ও জানালার কাছে মুখ এনে বললে, চললুম আজ, রাত অনেক হলো। আবার যেন দেখা পাই—এই কার্ডটা রইল, আমার ঠিকানা ওতেই পাবেন। গুডনাইট।

হকচকিয়ে যায় মালা মনীশের এই আকস্মিক ব্যবহারে। একটু ইতস্তত করে কিছু বলবার জন্যে মুখটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ির জানালার কাছে, কিন্তু কি ভেবে আবার সংযত করে নিল নিজেকে। শুধু হাত দুটো জোড় করে বোবা-নমস্কার জানালো একটা মনীশকে।

দিন দুই পরে আবার দেখা মনীশের সঙ্গে মালার। তবে সাক্ষাতটা ঘটল একটু যেন বিচিত্র ধরণে।...মালা অবাক হয়ে ভেবেছে অনেক দিন—ওই অদ্ভুত যোগাযোগটা ঘটল কিভাবে!

তার এক বান্ধবীকে নিয়ে মালা ছটার শোয়ে মেট্রোয় গিয়েছিল। টিকিট সে নিজে কিনে এনেছিল। সে সময়ে ধারেকাছে মনীশের চুলের টিকিটিও সে দেখতে পায় নি—তা হলে ঠিক তার পাশের সীটটা মনীশ পেল কি করে!

মনীশ পৌঁছেছিল শো আরম্ভ হয়ে যাবার পর। বোধ হয় ছটা বেজে দশ কি পনেরো হয়ে গিয়েছে তখন, হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, তার পাশে মনীশ এসে বসল।

প্রথমে সে চমকে উঠেছিল মনীশকে দেখে। তার পর মনীশ যখন তার পাশে এসে বসল তখন সে আরো বিস্মিত হলো। চুপ করে লক্ষ্য করতে লাগল শুধু মনীশকে সে অন্ধকারের মধ্যেই আড়চোখে।

মনীশ তার পাশে বসে একটু যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। মালার উল্টোদিকে হেলে স্ক্রীনের ওপরেই নজর রেখে বসেছিল সে। মনীশের আড়ষ্টতা দেখে মালার বুঝতে কষ্ট হয় নি একেবারেই যে, তার পাশে কোন মহিলাকে আশা করা তার সুদূর কল্পনার বাইরে ছিল।

তার পর বিশ্রাম সময়ে মালাকে ঠিক তার পাশে দেখে মনীশও যেন চমকে উঠল। ভূত দেখার মত অবস্থা হয়েছিল তার তখন। বিস্ময়ে আনন্দে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে কণ্ঠের ভাষা পর্যন্ত কে যেন হরণ করে নিয়েছিল তার।

মনীশ কিন্তু সেদিনে অতখানি প্রগলভতা দেখাল না। তার জন্যে মালা মনে মনে খুশিই হয়। হয়তো মালার বান্ধবীর উপস্থিতির জন্যে কিংবা তার গোপন ইঙ্গিতেই মনীশ সামান্য কয়েকটা কথা ছাড়া কোন সাড়াশব্দ দেয় নি আর হাউসের মধ্যে।

শো ভাঙার পর মালা নিজে থেকে মনীশকে আমন্ত্রণ জানালো তার সহগামী হবার জন্যে। মনীশও এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

বান্ধবী শোভাকে পার্কসার্কাসে নামিয়ে মোটর যখন বালিগঞ্জের পথ ধরল, মালা হঠাৎ প্রশ্ন করল মনীশকে, আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব? বাড়ি তো আপনার……

না, এখন আমি বাড়ি যাব না।…চলুন না, আপনাদের ওখানেই যাওয়া যাক্!

আমাদের বাড়ি—যাবেন আপনি? মালা যেন বিশ্বাস করতে পারে

না পুরোপুরি কথাটা!

যদি আপনার আপত্তি থাকে···না হয় থাক। একটু থেমে থেমে মালার মুখের দিকে তাকিয়ে মনীশ গম্ভীর স্বরে বললে।

না, আপত্তি কেন করব—বেশ তো, চলুন না।

সুব্রতবাবু কি এখন বাড়িতেই আছেন?

ঠিক বলতে পারছি না, তবে থাকা উচিত।

ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি, আর তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথাও আছে।

কি বিষয়ে? হঠাৎ মালা যেন একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

সে একটা ব্যাপার আছে।···দেখা হলে আপনার সাক্ষাতেই হতে পারবে তা।

গাড়ি কখন্ এসে পৌছে যায় বাড়ির সামনে, কথা বলতে বলতে উভয়ের কেউই তা লক্ষ্য করে নি। গেটের সামনে এসে সোফারকে ইলেকট্রিক হর্নটা বাজাতে দেখে খেয়াল হয় তাদের।

মনীশকে ড্রইংরুমে বসিয়ে মালা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুব্রতকে ডাকবার জন্যে। কিন্তু সুব্রতর খোঁজ নিতে গিয়ে জানল তখনও সে বাড়ি ফেরে নি। খুবই আশ্চর্য হয়ে পড়ে মালা। সাধারণত এত রাত পর্যন্ত সুব্রত তো বাড়ির বাইরে থাকে না!···সম্প্রতি এক অদ্ভুত খেয়ালেও পেয়ে বসেছিল তাকে। প্রতি দিন সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কি যেন করত সুব্রত। মালার মনে হলো, কদিন যাবৎ সুব্রতকে সে যেন একটু চিন্তিতও দেখছে।

যাই হোক, সে-ভাবনাটাকে মন থেকে সরিয়ে সে আবার ড্রইংরুমের দিকেই পা বাড়াল। অতিথি একলা বসে আছেন বাইরে, আগে তাঁর প্রতিই নজর দেওয়া দরকার।

মনীশ অনেক দিন আসে নি এ-বাড়িতে। পূর্বের গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান মালিকের আমলে—বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারল সে। মালার সুরুচির পরিচয় ড্রইংরুমের সর্বত্র সুপরিস্ফুট এবং সেটা যেন মনীশকে খুব খুশিই করে তুলল। ঘুরে ঘুরে দেখছে সে আর উত্তরোত্তর খুশি হয়ে উঠছে।

মালার আকস্মিক সন্তর্পণ প্রবেশ তাই টের পায় না মনীশ। হঠাৎ

পেছন থেকে আহ্বানের শব্দে একটু চমকে ফিরে দাঁড়ালো সে।

কি এত মনোযোগ দিয়ে দেখছেন ঘুরে ঘুরে? মালা স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

আপনার সুরুচির পরিচয়—খুব ভালো লাগল। মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে মনীশ।

ছাই! নিন্ বসুন এখন, চা খাবেন? ঠোঁটটা উল্টে মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বলে মালা।

না, থাক্ আজ, অনেক রাত হলো।...সুব্রতবাবু এলেন না?

মালা চিন্তিতমুখে বললে, এখনও ফেরেন নি দেখে এলুম।

এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকেন নাকি ভদ্রলোক? মালার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করে মনীশ।

না, আজই একটু রাত হলো দেখছি...

যাক্, ফিরবেন বোধ হয় এখনই। কোথাও আটকে গিয়ে থাকবেন কাজে-কর্মে।

কিন্তু মালা যেন কিরকম চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে অকস্মাৎ। কথা বলছে, কিন্তু প্রাণ নেই সে-কথায়।

মনীশ অপেক্ষা করল আরো মিনিট পনেরো। এটা-ওটা বিষয়ে আলোচনা চালাতেও চেষ্টা করল, কিন্তু মালার দিক থেকে সেরকম সাড়া পেল না আর। বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ালো সেও ফিরে যাবার অভিপ্রায়ে মালার কাছ থেকে বিদায় চাইল।

মনীশকে আবার আসবার জন্যে অনুরোধ করে মালা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এলো। তার পর তার সঙ্গে শুভরাত্রি বিনিময়ের পর হাত তুলে বিদায় জানিয়ে যে-মুহূর্তে ফিরে দাঁড়িয়েছে, কোথা থেকে অন্ধকারের বুক চিড়ে সুব্রত হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো।

থতমত খেয়ে যায় মালা। কি বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিল সে, সুব্রতর গম্ভীর কণ্ঠস্বরের আহ্বানে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আবার।

আমায় কিছু বলছেন?

হ্যাঁ, যে এসেছিল সে কে?

মনীশ লাহাড়ী!

কেন এসেছিল সে এখানে?

আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ভদ্রলোক এসেছিলেন।

ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে ওঠে সুব্রতর, ভদ্রলোক? কে ভদ্রলোক?

মালা অবাক হয়ে তাকায় সুব্রতর মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শংকিত হয়ে ওঠে মনে মনে, সুব্রত কি প্রকৃতিস্থ নেই?

মালা? অধৈর্য স্বরে ডেকে ওঠে সুব্রত।

বলুন।

মনীশের সঙ্গে তুমি মিশো না—লোক সে সুবিধের নয়।

ব্যথিত কণ্ঠে বলে ওঠে মালা, কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। ওর পাস্ট হিস্ট্রি অত্যন্ত ক্লেদাক্ত।

বুঝতে পারলুম না···

না-বোঝবার মত বয়স আর নেই তোমার মালা। আর আমিও খুব বাঁকা কথা বলি নি।

কিন্তু······

না মালা, আমার অনুরোধটুকু তোমায় রাখতেই হবে, তুমি ওর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করো না।

কিন্তু কেন, সেটা তো বলবেন? মালার কণ্ঠস্বরে কি বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল!

কারণ আছে বোন। যতক্ষণ না আমি সে-বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হতে পারছি, ততক্ষণ তোমাকে সব জানাতে পারব না। তবে এটুকু জেনে রাখো, তোমার ভালোর জন্যেই এই অনুরোধটুকু করছি।

কিন্তু একজন ভদ্রলোককে খামকা এখানে আসতে বারণ করি কি করে?

তুমি না পার, আমি খবর পাঠিয়ে দিতে পারি, যদি ঠিকানাটা তার জানিয়ে দাও।

কি ভেবে মালা বলল, ঠিকানা তাঁর জানান্ নি মনীশবাবু।

ওঃ, আচ্ছা।···চলো, ওপরে যাই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুব্রত বললে, একবার পিসীমার সঙ্গে দেখা করে আসছি—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। ততক্ষণ তুমি কাপড়-জামা ছাড় আর মানদাকে বলো ঠাকুরকে বলে দেয় যেন খাবার গরম

করতে।…

পিসীমার কাছে—এত রাত্তিরে কেন? নাকটা কুঁচকে মালা জিজ্ঞাসা করে ওঠে।

জানি না ঠিক—ডেকেছেন, একবার দেখা করে আসি।

সুব্রত কিন্তু পাঁচ মিনিটের জায়গায় পুরো আধ ঘণ্টা কাটিয়ে এলো। সত্যিই মালা বিস্মিত হয় সুব্রতর ব্যাপার-স্যাপার দেখে।

প্রভাসুন্দরীর ব্লকে সুব্রতর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুব্রতকে ছেঁকেমেকে ধরলেন ও একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে নাকিসুরে কেঁদে উঠলেন, বাবা, আমাকে বাঁচাও।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সুব্রত।…বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করে টেলিগ্রামটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

আমাকে শ-পাঁচেক টাকা পাঠাতে পার? ভীষণ দরকার। জীবন-মরণ অবস্থা।—রতন

প্রভাসুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছেন, রতন কত ভদ্র, সে জানে আমার অবস্থা কি—সেজন্যে মরীয়া হয়েই শেষ চেষ্টা হিসেবে এইভাবে লিখেছে। নিশ্চয়ই তার হাতে কিছু নেই। আমার ভয় হচ্ছে আত্মহত্যা না করে বসে শেষ পর্যন্ত।

সুব্রত একটু নির্দয়ভাবেই উত্তর দেয়, না, তা সে করবে না।

তুমি জানো না তাকে। আমি তার মা—সেজন্যে খুব ভালোভাবে নিজের ছেলেকে চিনি। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না যদি সে যা চেয়েছে সেটুকুর ব্যবস্থা করতে না পারি।…কতকগুলো শেয়ার আছে—সেটাই বেচে তোমাকে এই ব্যবস্থাটুকু করে দিতে হবে বাবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত।—দেখুন পিসীমা, ওভাবে ছেলেকে নষ্ট করবেন না। টাকা চাইলেই যদি সে পায়, তা হলে জীবনে আর সে নিজেকে শোধরাবার অবকাশ পাবে না।

তুমি এত নিষ্ঠুর, সুব্রত! হতভাগা ছেলেটার ভাগ্যটাই খারাপ…

সুব্রত চুপ করে যায়—এই ধরনের মায়েদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা বুঝে।

এর পর টাকার অঙ্কটা কমিয়ে কমিয়ে দেড়শোয় এনে দাঁড় করায় সুব্রত, কিন্তু প্রভাসুন্দরী বিশেষ জোর দিয়ে জানিয়ে দিলেন, যেন পরের দিন সকালেই সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর ছেলের নামে।

মালা জানে, সেই টাকাটা সুব্রত তার নিজের পকেট থেকেই দিয়েছিল—পিসীমার ওই সামান্য খুঁদকুড়োয় আর হাত দেয় নি।

সুব্রতর এই ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মালা। আর তাই নিয়ে একদিন সে কথাও তুলেছিল সুব্রতর সামনে।

তার উত্তরে সুব্রত হেসে বলেছিল, কেন, আমি এমন কিছু অসাধারণ কাজ তো করি নি। প্রত্যেক ফ্যামিলিতেই এরকম ছেলে থাকে আর তাদের সামলাবার জন্যে ব্যবস্থা করারও দরকার হয়।

কিন্তু আপনি কে—ওদের ফ্যামিলির আপনি তো কেউ নন!

তা হয়তো সত্যি, তবু কুন্তীর ফ্যামিলি মানে আমারই, তাই নয় কি?

আপনি মহৎ—আপনি উদার। আমিও পারতুম না বোধ হয় এতখানি।

পারবে তুমি—তোমার বয়স হোক, আঠারো বছর পার হয়ে যাক্—তখন সব কিছু করবে।...কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই তোমাকে, যখন কথাটা উঠলই—কখনও এই ধরনের লোকদের প্রশ্রয় দেবে না। একান্তই যদি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ে, তখন টাকার অঙ্কটা কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে বা এক-পঞ্চমাংশে এনে দাঁড় করাবে। যে যে-ধরনের লোক, তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করবে। আর বাৎসল্য-স্নেহে-অন্ধ মায়েদের কান্নায়ও ভুলো না কখনো।...এই যে রতন ভয় দেখিয়েছে আত্মহত্যা করবে বলে—সে কি কখনও তা করবে ভেবেছ?

কখনও না? কৌতূহলী চোখেমুখে মালা প্রশ্ন করে।

না বোন, না। ওদের সৎসাহস বলে কিছু নেই।

নাই থাকুক, মালা তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। সে তার চেয়েও বড় ব্যাপারে এখন নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে দিন দিন। মনীশের সঙ্গে তার মাখামাখিটা এখন এত ঘনিষ্ঠতম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, অন্য বিষয়ে কিছু ভাবা বা আলোচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে দিন দিন।

সুব্রত নজর রেখেছে তার ওপর। মালা বেশ বুঝতে পারে, সুব্রত

ওৎ পেতে রয়েছে আবার কবে মনীশকে দেখতে পায় তারই আশায়। কিন্তু মনীশ আর এ বাড়িতে আসবে না। মালাই বারণ করে দিয়েছে তাকে।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে মালা আর শংকিত হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। সুব্রত যেন কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠছে দিন দিন। কিরকম যেন বিব্রত ভাব, কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত লক্ষণ, একটা দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে ফুটে উঠছে তার চোখেমুখে। আগের চেয়ে কম কথা বলছে, কিন্তু যখন বলছে, তখন সে-কথাগুলোর মধ্যে অপ্রকৃতিস্থেরই লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

হঠাৎ একদিন মালাকে দুম করে প্রশ্ন করে বসল সুব্রত, আচ্ছা, কুন্তী তোমার সঙ্গে বেশ মন খুলে কথাবার্তা বলত?

অবাক হয়ে মালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে সুব্রতর দিকে। তার পর ঢোক গিলে বললে, কেন, হ্যাঁ বলত বৈকি। তা—হ্যাঁ, কোন্ বিষয়ে?

এই, তার নিজের সম্বন্ধে—তার বন্ধুদের বিষয়ে—কিভাবে তার দিন কাটত—সে সুখী অথবা অসুখী ছিল…এই ধরনের আর কি।

মালার মনে হলো, সুব্রতর মনের কথাটা যেন সে ধরতে পেরেছে।… বোধ হয় কুন্তলার প্রেমের ব্যাপারটা কোন রকমে জানতে পেরেই সুব্রত এরকম করছে।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে মালা ভেতরে ভেতরে। মৃদুকণ্ঠে কোন রকমে উত্তর দিলে তাই, আমার সঙ্গে সেরকম কথাবার্তা খুব হতো না, মানে, খুব ব্যস্ত থাকত তো সে সারাদিন—কথা বলবার ফুরসতই বা কোথায় ছিল!

হ্যাঁ, তার ওপরে তোমার বয়সও অল্প, তোমার সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা হয়তো করত না।…তবুও মনে হলো, যদি কিছু বলে থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম। সুব্রত কিরকম এক শূন্য উদাস দৃষ্টিতে তাকায় মালার দিকে।

মালা চাইল না সুব্রতকে আঘাত দিতে। তা ছাড়া কুন্তলা নিজে থেকে তো আর তাকে কিছু বলে নি। সুতরাং ওর মনে কষ্ট দিয়ে কি লাভ!

মালা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুব্রত। তার পর ভারাক্রান্ত মনে বললে, যাক, হয়তো ভুল—আমারই ভুল। থাক্।

এর পরে আর-এক দিন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল সুব্রত, আচ্ছা বলতে পার, কুন্তীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিল কে কে ?

মালা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে উত্তর দিলে, বিজলী চ্যাটার্জি, শোভনা সেন, মৃন্ময়ী গাঙ্গুলী, সবিতা বোস, অপর্ণা কুণ্ডু……

তাদের সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্টতা ছিল কুন্তীর ?

ঠিক তা বলতে পারব না আমি।

মানে, আমি জানতে চাইছি আর কি—তাদের কাউকে কুন্তী তার মনের কথা কিছু বলত কিনা।

সত্যি আমি কিছু জানি না—আর আমার মনেও হয় না সেরকম কিছু···আচ্ছা, কি ধরনের কথা আপনি জানতে চাইছেন, বলুন তো ?

প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই মালা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল—উচিত হলো না কথাটা জানতে চাওয়া। কিন্তু পরমুহূর্তে সুব্রতর উত্তরটা তাকে আরো অবাক করে দিল।

কুন্তী কারো ভয়ে ভীত ছিল—এরকম কিছু বলেছে কিনা ?

সুব্রতর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললে মালা, ভীত ?

মানে, তার কোন শত্রু ছিল কিনা ?

মেয়েদের মধ্যে ?

না, হ্যাঁ—মানে, সত্যিকারের শত্রু। হয়তো যাদের তুমি চেনো বা জানো তাদের মধ্যে কেউ নেই—আবার থাকতেও পারে···

মালার বিস্মিত অদ্ভুত চাউনির সামনে সুব্রত কিরকম যেন হয়ে যায়। ঘেমে লাল হয়ে মিউ মিউ করে বলে ওঠে সে, হয়তো অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাটা, মানে, আমিও কম বিস্মিত হই নি······

তার পরের দিনে সুব্রত আবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল মালাকে, ভোসেদের সঙ্গে কুন্তীর কত দিনের আলাপ-পরিচয় জানো ?

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয় মালা, ঠিক জানি না আমি তা জামাইবাবু।

তাদের সম্বন্ধে কোন্ কথা হয় নি কখনও তোমার সঙ্গে ?

কই, না তো।

• আচ্ছা, খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তোমার দিদির সঙ্গে ওদের, না?

হ্যাঁ, তা একটু একটু ছিল।

হুঁ। ওই পুরীতে আলাপের পর থেকেই……

মালার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে যায়, শুনেছি দিদিরা দার্জিলিং-এও বেড়াতে গিয়েছিল একবার।

ফোঁস করে ওঠে সুব্রত, সে তো অজয় ভোসের সঙ্গে একলা, অলকা ছিল না সে-পার্টিতে।

মালা কোন কথা বলল না। দৃষ্টি নত করে পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝের ওপর ঘষতে থাকে।

এ সম্বন্ধে অলকা ভোস কিছু বলে নি তোমাকে?

সজাগ হয়ে ওঠে মালা। মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সুব্রতর দিকে, কি সম্বন্ধে?

অজয় ভোসের সঙ্গে কুন্তীর এই যথেচ্ছ বিহার সম্বন্ধে।

মালা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, ঢোক গিলে বললে, না, বলে নি কিছু।

সুব্রত বললে, হুঁ, অলকা মেয়েটা তো খুব চাপা, সহজে মুখ খুলবে না। তবে এই ধরনের মেয়েরা তাদের স্বামীদের ওপর কড়া নজর রাখে বলে জানতুম।

মালা নীরব।

সুব্রত আবার প্রশ্ন করল, কুন্তীর সঙ্গে অলকার বেশ ভাব ছিল?

না, সেরকম আর কই ছিল, মালা খোপাটা ঠিক করতে করতে বললে, দিদি অলকাদিকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। চালিয়াৎ, দেমাকী, মিথ্যে-বাদী, হিংসুটে বলে গালাগাল দিত প্রায়ই।

সুব্রত ঘাড়টা নাড়ল এদিক থেকে ওদিকে বারকয়েক। তার পর একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল আবার, কিন্তু মনীশ লাহাড়ীর সঙ্গে বেশ ভাব ছিল!

হ্যাঁ, তা একটু ছিল।—মালার গলার স্বরটা যেন বড্ড মিয়নো শোনাল।

সুব্রত কিন্তু এবার আর মনীশের সম্বন্ধে মারমুখী হয়ে কথা বলল না, বরঞ্চ একটা যেন কৌতূহলী স্বর ফুটে উঠল তার গলায়, লোকটা জমাতে পারে খুব, তাই না? আর জীবনে দেখেছেও অনেক কিছু।…এ সম্বন্ধে

তোমায় কিছু বলেছে ?

সেরকম কিছু না। শুধু অনেক ঘুরেছে, সারা পৃথিবীময় বেড়িয়েছে—এই কথাই বলেছে।

ব্যবসা-সূত্রে, আমার মনে হয় ?

হ্যাঁ, তাই।

কিসের ব্যবসা করে ও ?

তা আমি জানি না।

এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্টএর ব্যবসা কি ?

তাও জানি না।

আমার এই জিজ্ঞাসার কথা তাকে যেন আবার জানিও না—আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি এখনও। লোকটার গতিবিধি বেশ রহস্যজনক বলেই মনে হয় আমার।...কুন্তী বোধ হয় ওর সম্বন্ধে জানত কিছু কিছু!

হ্যাঁ, তা হয়তো জানত।

কিন্তু ওর সঙ্গে কুন্তীর পরিচয় খুব বেশিদিনের ছিল না—তবে লোকটা এসেই কুন্তীর মন জয় করে নিয়েছিল।

মালা কোন কথা বললে না।

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, যখন কুন্তী ওকে তার জন্মদিনের পার্টিতে নেমন্তন্ন করবে বলে ঠিক করল। অথচ ওর চেয়েও বেশি পরিচিত ও নিকটতম লোককে কুন্তী লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছিল।

মনীশবাবু খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারেন। মালা শান্ত গলায় বললে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা ঠিক, বোধ হয় সেজন্যেই ইনভাইটেড হয়েছিল!

সুব্রতর কণ্ঠস্বরে কি বিদ্রূপ-বাণ ফুটে উঠল ?

মালার মনে হঠাৎ সেদিন রাত্তিরের সেই চোখ-ঝলসানো পার্টির স্মৃতিটা জেগে উঠে তাকে কেমন যেন বিমনা করে দিল।...

কুন্তীবাঈয়ের বড় প্রিয় শিশমহলে জলসার আয়োজন হয়েছিল সেদিন রাত্তিরে। ঘরের মধ্যেই স্টেজ বাঁধা হয়েছিল। নাচ-গান-পিয়ানো বাদ্য সবই ছিল প্রোগ্রামের মধ্যে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী সব অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক-এক করে। অতিথিরাও সকলে উপস্থিত ছিলেন: মালা নিজে, মনীশ লাহাড়ী, কুন্তলা, অজয় ভোস, সেবা কর, সুব্রত, অলকা

ভোস……

কুন্তলাকে সেদিন কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। যেন রূপকথার রাজকন্যার মত।…না-না, তার কথা ভেবে আর কি হবে! তার চেয়ে নিজের কথা ভাববে সে।…হ্যাঁ, সেদিন প্রথম দেখেছিল সে মনীশকে আর প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছিল তাকে। ভদ্রলোক সত্যিই ভালো,—কথা-বার্তা, আলাপ-আচরণ সত্যিই সুন্দর তাঁর। ও-রকম লোকের সম্বন্ধে যারা কু রটায় তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে ঘৃণা বোধ করে সে…

চমকে ওঠে মালা সুব্রতর আচমকা প্রশ্নে, লোকটা সেদিন রাত্তিরে যেন হাওয়ায় মিশে গেল ফাংশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—কোথায় গিয়েছিল সে সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলেছে?

হ্যাঁ, ইউরোপে পাড়ি দিতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু সেদিন রাত্রে কাউকে একবারও বলল না কেন সে কথা?

মালা প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে, কেন বলবে? আর তা ছাড়া সে কথা শুনতে চেয়েছিল কি কেউ তাঁর কাছ থেকে?

সুব্রতর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, না, তা অবশ্য ঠিক। যাগ গে, পুরনো আলোচনায় আর দরকার নেই।…আচ্ছা, লাহাড়ীকে একদিন নেমন্তন্ন করলে কেমন হয়?

মালা মনে মনে খুশি হয়। ভাবে, সুব্রতর মন থেকে অহেতুক সন্দেহটা তা হলে চলে গিয়েছে।

এর পর মনীশকে সত্যিসত্যি একদিন রাত্তিরে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করল সুব্রত। সে আসতে রাজীও হলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর এলো না। চিঠি লিখে জানিয়ে দিল, খুব জরুরী কাজে তাকে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হচ্ছে বলে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারল না আর!

ওই ঘটনার দিন সাতেক পরে একদিন সন্ধ্যের মুখে সুব্রত আবার চমকে দিল মালাকে। বাড়ি ফিরে হঠাৎ জানালো, সে একটা বাড়ি কিনেছে।

বাড়ি কিনেছেন? মালা যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা।

হ্যাঁ, কেন কিনতে পারি না?…সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকব বলে ঠিক করেছি।

কোথায়? কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায়?

না-না, হেসে উঠল সুব্রত, এই কলকাতায়ই—নিউ আলিপুরে।

কেনবার আগে আমাদের দেখালেন না একবার?

চান্স পেলুম না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেললুম।

কতগুলো ঘর আছে? খালি না লোক আছে?

খানকয়েক আছে—ছোট বাড়ি তো, তবে খালি পেয়ে গিয়েছি।

তা ওখানে থাকবেন কেন?

এই মাঝে মাঝে, ধরো, শনিবার বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত—আবার বিকেল থেকে যেমন এখানে আছি থাকব।

হঠাৎ? কিছু স্পেশাল এট্রাকশান আছে? মালা হাসিমুখে প্রশ্ন করে।

না, সেরকম কিছু নেই। তবে আমার প্রতিবেশী হিসেবে ভোস ফ্যামিলিকে পাব।

ভোস ফ্যামিলি? মালার ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে ওঠে, মানে, অজয়বাবু ও অলকাদিকে?

হ্যাঁ, ওদের বাড়ি আমার এই নতুন বাড়ি থেকে মিনিট দুয়েকের পথ মাত্র।

আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য?

না, আচ্ছা, বাড়ি তো কিনলেন, এখন সেটাকে বাসোপযোগী করে তুলতে হবে না!

সে ব্যবস্থা করেছি।

তাও হয়ে গিয়েছে! মালার বিস্ময় যেন বাধ মানে না।

হ্যাঁ, সব কাজ কমপ্লিট। সেবা যতক্ষণ আমার কাছাকাছি থাকবে, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত।

সেবা কি তা হলে সেই বাড়িতে থাকবে এখন থেকে?

এখনও ঠিক হয় নি, তবে সেবাকে আমি এই অনুরোধটা করেছি।

যদি থাকতে রাজী হন সেবাদি, আপনার অনেক সুবিধে হবে।

তা হবে।···আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, ভোসেরা প্রতিবেশী হিসেবে খুব খারাপ হবে?

না-না, তা কেন হবে—বরঞ্চ ভালোই হবে।

হঠাৎ মালা যেন কেমন বিমনা হয়ে যায়। নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে চিন্তার ঘূর্ণিপাকে।

সুব্রত বাড়ি কিনল এত জায়গা থাকতে নিউ আলিপুরে! কেন? তবে কি ভোসেদের প্রতিবেশী হিসেবে পাবার জন্মেই ইচ্ছে করে সে একাজ করল?

কিন্তু কেন? কেন ভোসেদের সম্বন্ধে ওর এত আগ্রহ? কিসের জন্যে এইভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করতে বসেছে—কি তার উদ্দেশ্য?

তা হলে কি অজয় ভোসের সঙ্গে কুন্তলার কোন সন্দেহজনক ব্যাপারের ইঙ্গিত পেয়েছে সে? কিন্তু সেই পুরনো ঘটনাকে মনের মধ্যে টেনে এনে জেলাসী বোধ করা এখন ঠিক সাজে না আর সুব্রতর পক্ষে। তাতে লাভ কি?

মালার মনে হলো, সুব্রতর সাম্প্রতিক পাগলামির এই বোধ হয় কারণ। কুন্তলার ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিদের সে যেন সহ্য করতে পারছে না—একটা অন্তর্গূঢ় ব্যথায় টনটন করে উঠছে তার বুকের ভেতরটা।

মনে মনে হাসল মালা। লোকটা এবার নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবে এই অহেতুক জেলাসীর জ্বালায়। কিন্তু কিভাবে তাকে সেই পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবে তাও ভেবে পায় না মালা।

দিন কেটে যেতে লাগল হু-হু করে। মালা মাঝে মাঝে যায় সুব্রতর নিউ আলিপুরের বাড়িতে।···সুব্রত পনেরো দিনের মধ্যে দু-দুবার ভোজ দিল ভোস-দম্পতিদের। তারাও পাল্টা ভোজ দিল সুব্রত, মালা ও সেবাকে আমন্ত্রণ করে।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল। কোন নতুনত্ব নেই, কোন কিছু নতুন ঘটতেও দেখা গেল না। শুধু সুব্রতর ছিটগ্রস্ত ভাবটা যেন আরো সামান্য বেড়েছে এই সময়টুকুর মধ্যে বলে মনে হলো মালার। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করল মালা, সুব্রত তার নিউ আলিপুরের বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়ার পার্টটা যেন হঠাৎ কমিয়ে ফেলেছে।

খুশি হলো মালা মনে মনে খুব। যাক্, যদি সুব্রত এবার সামলে উঠতে পারে ভোসেদের সান্নিধ্য ছেড়ে! খুশি হয়েই তাই সেদিন সে একটু বেশি রাত পর্যন্ত সুব্রতর সঙ্গে এটা-ওটা বিষয়ে নানান্ গল্প করে তার মনটাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করল। তার পর শুতে গেল যখন তখন

রাত বারোটা বেজে গিয়েছে।

মনটা তারও হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। তাই বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু মাঝরাত্তিরে সে-সুখনিদ্রা ভেঙে গেল দরজায় মৃদু করাঘাতের আওয়াজে।

চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মালা বিছানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সেই আওয়াজটা আবার হলো দরজার বাইরে থেকে। কে যেন খুব সাবধানে অন্যের কান বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে টোকা মারছে।

বেড-সুইচটা টিপল মালা ও চোখটা রগড়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। মাত্র দেড়টা বেজেছে। সে বারোটায় শুয়েছে—রাত তো তা হলে বেশি হয় নি!

বিস্রস্ত কাপডজামা ঠিক করতে করতে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভীতু গলায় জিজ্ঞাসা করল মালা, কে?

আমি! শ্রান্ত গলায় সুব্রত সাড়া দিল ওপার থেকে।

কিছুটা আশ্বস্ত হলেও পুরোপুরি যেন হতে পারে না মালা। কোন রকমে খিলটা খুলে সামনে দাঁড়াল সে সুব্রতর।

কিন্তু এ কী দেখছে সে! বিস্ময়ে চোখের পাতা পড়ে না মালার। সুব্রতর কাপড়জামা তখনও ছাড়া হয় নি। সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে ফেরার পর যে-জামাকাপড় পরা ছিল সেইরকমই সব পরা দেখল তখনও। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। মুখখানায় কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে।

জড়ানো গলায় সুব্রত বললে, ড্রইংরুমে এসো মালা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।...আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব কথাগুলো বলতে না পারলে।

মালার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়। তার সঙ্গে কথা—এত রাত্তিরে! যেন নিজের কানটাকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তার পর ত্রস্তপায়ে অনুসরণ করল সুব্রতকে।

ড্রইংরুমে এসে ঢুকল দুজনে। সুব্রত দ্রুতহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার পর মালার সামনে এসে বললে, বসো ওই সোফাটায়। সে নিজে এসে বসল মালার ঠিক মুখোমুখি আর একটা সোফায়। সিগারেট

কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল সেটা।

মালা লক্ষ্য করল, সুব্রতর হাতটা কাঁপছে ঠকঠক করে। কেমন যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি আর বিচলিত ভাব সর্বাঙ্গে।

ঘাবড়ে যায় মালা। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ানো ভাবটা আরো যেন বেড়ে গেল তার। তার পর মরীয়া হয়েই আতংকিত গলায় অনুচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, জামাইবাবু!

সুব্রত হাঁপাচ্ছে তখনো! কোন রকমে সে উচ্চারণ করলে, আমি আর পারছি না নিজেকে সামলাতে। আর চেপে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বলো, বলো আমাকে—তোমার কি মনে হয়, এটা কি সত্যি, তা কি সত্যিই সম্ভব ?

মালার চোখ তখন কপালে উঠেছে, কি বলছেন জামাইবাবু ? কি হয়েছে ?

তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, দেখেছ—নিশ্চয়ই তোমাকে সে কিছু বলেছে। একটা কারণ আছে বৈকি…

মালা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সুব্রতর দিকে চেয়ে।

সুব্রত কপালের ওপর হাতটা বুলোতে বুলোতে বললে, আমি যা বলছি তুমি কেন বুঝতে পারছ না—না-না, ওভাবে তাকিও না মালা, আমাকে এইটুকু সাহায্য করো। যাহোক কিছু বলো ভেবেচিন্তে।… কথাগুলো আমার একটু অপ্রকৃতিস্থের মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু তা আর মনে হবে না, যদি চিঠি দুটো দেখ।

কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত তার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দু টুকরো কাগজ বার করে আনল ও তার মধ্যে একটা মালার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

মাত্র কয়েক লাইন লেখা। বেশ পরিষ্কার ভাবে গোটা গোটা অক্ষরে রয়াল ব্লু কালিতে পাতার মধ্যিখানে লেখা অক্ষর কটা :

তুমি মনে করেছ তোমার বউ আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু তা নয়, সে নিহত হয়েছে।

এইবার এইটে পড়ো।—সুব্রত দ্বিতীয় চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল।

তোমার বউ, কুন্তীবাঈ, নিজেকে নিজে হত্যা করে নি। সে খুন হয়েছে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মালা চিঠি দুটোর দিকে চেয়ে।

সুব্রত বললে, তিন মাস আগে পাই ওদুটো। প্রথমে ভাবলুম কেউ বুঝি ঠাট্টা করে পাঠিয়েছে। তার পরে একটু একটু করে চিন্তা শুরু হলো। কিন্তু কোন কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। কুন্তী আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? কি কারণে?

মালা অস্ফুট স্বরে বললে, কেন, ইনফ্লুয়েঞ্জার পর…

উঁহু, তুমি যদি একটু ভেবে দেখ, তলিয়ে দেখ ব্যাপারটার মধ্যে, তা হলে বুঝতে পারবে, যুক্তিটা অবাস্তব ছাড়া আর কিছু নয়। কত লোকেরই তো ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, কই তারা তো আত্মহত্যা করছে না!

মালা অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলে, হয়তো—হয়তো সে অসুখী ছিল।

হ্যাঁ, মানলুম আমি তোমার কথাটা, সুব্রত নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তাই বলে কুন্তী আত্মহত্যা করবে কেন? সে ভয় দেখাতে পারত, অন্য অনেককিছু করতে পারত, কিন্তু আত্মহত্যা করবে কেন?

কিন্তু সে যে একাজ করেছে তা তো নিশ্চিত জামাইবাবু—আর তা ছাড়া কি হতে পারে?…তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের শিশিও পাওয়া গিয়েছিল…

সব মানলুম—তার আত্মহত্যার স্বপক্ষে সব প্রমাণই মেনে নিলুম, তবুও মন যেন মানতে চাইছে না। এই চিঠি দুটো পাবার পর থেকে আমি যতই ভাবছি ব্যাপারটা সম্বন্ধে, ততই মনে হচ্ছে আমার—একটা গভীর রহস্য আছে কুন্তীর মৃত্যুর মূলে। আর সেই জন্যেই বার বার আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি মালা—কুন্তীর কোন শত্রু আছে কিনা, এমন কোন লোকের বিষয়ে সে তোমাকে কিছু বলেছে কিনা, যার সম্বন্ধে সে ভীত বা সন্ত্রস্ত ছিল।

জামাইবাবু, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়…

হ্যাঁ, আমিও ভাবি তাই মাঝে মাঝে, আবার মনে হয় পরমুহূর্তে, না, আমি সকলের চেয়ে সুস্থ।…না-না আমাকে জানতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে। তোমাকেও সাহায্য করতে হবে, ভাবতে হবে, মনে

করতে হবে—সেদিন রাত্তিরের সব ঘটনাগুলো মনের মধ্যে এনে ফেলতে হবে, স্মৃতির পাতা একটার পর একটা উল্টে বলতে হবে আমায়—যেই হত্যা করে থাকুক তাকে, সেদিন ওই টেবিলে সে নিশ্চয়ই ছিল, ওর পাশেই ছিল হয়তো, না হলে কি করে মরল কুন্তী ?···

মালা অনেক ভেবেছে, স্মৃতির জীর্ণ পাতাগুলো নেড়েচেড়ে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছে আপ্রাণ, কিন্তু পারে নি কিছুই ভেবে বার করতে। শুধু ভেসে ভেসে উঠেছে চোখের সামনে সেদিনকার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলো—নাচ-গান-হল্লা, আর তার পরেই সেই বীভৎস দৃশ্য—কুন্তীর মৃত্যুনীল হিমশীতল দেহ, দুমড়ে মুচড়ে কে যেন ফেলে রেখে দিয়েছে ডাইনিং-হলের প্রশস্ত মেঝের এক প্রান্তে।

উঃ, সে কী ভীষণ, কী হৃদয়-বিদারক মর্মান্তিক দৃশ্য! ভাবতেও মালার বুকখানা যেন ভেঙে যায়। শিউরে শিউরে ওঠে তার সমস্ত শরীর।

তবুও নিস্তার নেই, ভাবতে হচ্ছে, ভাবতে হবে তাকে—সেদিনকার সেই ঘটনার আদ্যোপান্ত ভেবে বার করতে হবে—কে ছিল কুন্তলার পাশে, কে করল একাজ!

॥ দুই ॥

সেবা কর!

ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে উঠল সেবার খামখানার দিকে তাকিয়ে। সুব্রতর আহ্বান!

কেন? কিসের জন্যে?

যাবে না আর সে তার কাছে হ্যাংলার মত এভাবে বার বার। একদিন তাকে জীর্ণ কাপড়ের মত যে ত্যাগ করল, এক বারও ভেবে দেখল না তার ভবিষ্যতটার কথা, তার ডাকে কেন সে সাড়া দেবে?

ঠিকই বলেছে রতন। রতন তার চোখ খুলে দিয়েছে। সত্যিই সে তার বন্ধুর মতন। ভাগ্যিস এই অমূল্য বন্ধুর সঙ্গে তার যোগাযোগ

হয়েছিল, তাই না আজ সে তারই চিন্তার ধারায় চিন্তা করে পরিষ্কার বুঝতে পারল, চিনতে পারল সুব্রতকে!

মালা আশ্চর্য হয়ে ভাবে, একজনকে চিনতে একজনের কতই না সময় লাগে। যে সুব্রতর সঙ্গে সে দীর্ঘ কুড়ি বচ্ছর ঘর করল, তাকে চিনতে তার কত দেরি হলো!

অথচ কদিন আগে পর্যন্ত কি সাহায্যই না সে করেছে এই সুব্রতকে। সে না থাকলে সুব্রতর অস্তিত্ব থাকত আজ কোথায়? বিপদে-ঝঞ্ঝাটে-অসুবিধায় সে সর্বদা থেকেছে সুব্রতর পাশাপাশি।

তার বিনিময়ে সে পেয়েছিল ছোট্ট একটি আশ্বাস। সেটাই সম্বল করে বুক বেঁধে পড়ে ছিল সে এত দিন।

কিন্তু সুব্রত সে আশ্বাসটুকুও কেড়ে নিল—তাকে ঠেলে ফেলে দিল অন্ধকারের মধ্যে তার সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে দিয়ে।

এই কি ভদ্রসমাজের খোলস? আজকালকার সভ্যসমাজের এই কী রীতি?...

কুন্তীবাঈ!

কে কুন্তীবাঈ? একজন সামান্য বাঈজী ছাড়া আর কিছু নয় সে। তার জন্যে সুব্রত তাকে ত্যাগ করল ভাবতেও কষ্ট হয় সেবার। চোখ দুটো জলে ভর্তি হয়ে আসে। অঝোরঝরে কাঁদল সে কিছুক্ষণ।

পরমুহূর্তে চিন্তা করে সেবা, একজন যদি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তার জন্যে সেও কেন সেরকম দুর্ব্যবহার করতে যাবে তার সঙ্গে? কই, এত দিন তো সে সেরকম ব্যবহার করে নি সুব্রতর সঙ্গে!

কুন্তীবাঈকে বিয়ে করেছে সুব্রত তার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়েই। অবশ্য অনুমতি না দিলেও সুব্রত করত নিশ্চয়ই এ কাজ। সুব্রতর বিয়ে করা বউ তো আর নয় সে। সুব্রতর বাবা বলে গিয়েছিলেন ছেলেকে—ছেলেও কথা দিয়ে এসেছিল শেষ পর্যন্ত যে, তাকেই বিয়ে করবে সে। তবুও যখন বিয়ে হয় নি, তখন সুব্রতর অন্যত্র বিয়ে করায় সেবা আপত্তি করে কি করে? আর তার আপত্তি শুনতই বা কে?

তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে, সব ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে সুব্রতকে ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছে সে।

সুব্রত তার প্রিয় ছিল বলে কুন্তীবাঈও তার আপনার জন হয়ে পড়ল

স্বাভাবিক ভাবে। সত্যি, কুন্তীকে তার মন্দ লাগে না। বেশ সাদাসিধে প্রাণখোলা মেয়েটা। নিজের ফুর্তি নিয়েই আছে সে।

তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কোন উত্তাপ বোধ করে নি সে—একমাত্র সুব্রতকে কেড়ে নেওয়ার দরুণ একটা বেদনা বোধ ছাড়া। কিন্তু সেটা সে গায়ে মাখে নি আদৌ। আর সেজন্যেই পেরেছে সে কুন্তীকে অবাধে সাহায্য করতে অনেক ব্যাপারে, পেরেছে তার সঙ্গে হেসে কথা বলতে, পেরেছে তার বাড়িতে যখন-তখন তার আহ্বানে ছুটে যেতে।

তাই সেদিন সুব্রত যখন তাকে ডেকে বললে, সেবু, আমার একটা উপকার করবে, সে 'না' বলতে পারে নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সুব্রতর দিকে।

সুব্রত বাধো-বাধো কণ্ঠে বললে, কাজটা একটু অপ্রিয় ধরনের, তবু তুমি ছাড়া গতি নেই।

সেবা ঘাড়টা নাড়ল ঈষৎ সম্মতির ধরনে।

সুব্রত কাশল একবার, তার পর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, প্রায় প্রত্যেক ফ্যামিলিতেই এই ধরনের বদ্ ছেলে আজকাল একটা-আধটা দেখতে পাওয়া যায়।···আমার স্ত্রীর পিসতুতো ভাই—একেবারে বখে গিয়েছে যাকে বলে। তার মা তো প্রায় হৃতসর্বস্ব হয়ে গিয়েছে এই ছেলেরই দরুণ, এখন সে সেদিক থেকে সুবিধে করতে না পেরে চুরি-জোচ্চুরি-ছেঁচড়ামি শুরু করেছে। জেলও খেটেছে এই চুরি-জোচ্চুরির জন্যে বার দুই।

খুনেটুনে নয় তো? সেবা ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করে ওঠে।

না, সেরকম কিছু নয়। তবে ভীষণ চৌকশ আর চোখে-মুখে-নাকে কথা বলে। আসল দোষ তার—বড্ড স্পেকুলেটিভ। টাকা-পয়সা হাতে থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও পেছিয়ে পড়ে না, ধারদেনা করে চুরি-জোচ্চুরি করে টাকা নিয়ে এসে সেই টাকায় স্পেকুলেশন করবেই। মুশকিল হয়েছে, এখন সে কুন্তীর ওপর ভর করেছে—যা এ্যাদ্দিন করে নি। অনবরত বিরক্ত করতে শুরু করেছে টাকা-টাকা করে। আমার ভালো লাগে না এই ধরনের লোকদের, সেই জন্যেই তার সঙ্গে কাল বিকেল চারটের সময় এপয়েন্টমেন্ট করেছি একটা ফয়সালায় আসব বলে। কিন্তু আমি পারব না সে কাজ করতে—দরদস্তুর ও অন্য সব কথাবার্তা

চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব। কুন্তীও ছেলেমানুষ এই ধরনের কাজে। বাধ্য হয়ে তাই তোমার শরণাপন্ন হলুম তোমাকে উপযুক্ত ভেবে।

হ্যাঁ, লোক চিনেছ ভালো, একপ্রকার কাষ্ঠ-হাসি হেসে বললে সেবা, তা ব্যবস্থা কিরকম হবে শুনি!

এক হাজার টাকা নগদ ও রেঙ্গুনগামী জাহাজের একখানা টিকিট কিনে দেবো তাকে। টাকা দেওয়া হবে তাকে জাহাজে ওঠার পরে, ছাড়বার ঠিক এক মিনিট আগে!

সেবা হাসল, বললে, বুঝলুম তোমার বক্তব্য। তুমি চাও, সে যেন সত্যিসত্যিই রেঙ্গুনে পাড়ি দেয়।

যাক্, বুঝতে পেরেছ তা হলে।

এমন কিছু শক্ত কথা বলো নি তো তুমি। সেবা একটু উদাসীনভাবে জবাব দেয়।

না, তা সত্যি। সুব্রত ইতস্তত করে বলে, তুমি কিছু মনে করবে না তো এটুকু করতে?

না, মনে আর কি করব, মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে সেবা, আর না করলেও তো পার নেই। যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার সে বিষয়ে।

হে-হে, তা জানি আমি। তোমার দ্বারা যে একাজ অতি অনায়াসেই করা সম্ভব তা জানতুম।

হ্যাঁ, প্যাসেজ বুক করার ব্যবস্থা কি কিছু হয়েছে? নামটা কি ভদ্রলোকের?

রতন গুপ্ত। টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। জাহাজ পরশুদিন আউট-রাম ঘাট থেকে ছাড়বে।

সেবা টিকিটটা চেয়ে নেয়। তার পর সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্যানিটি-ব্যাগের মধ্যে পুরে বললে, ঠিক আছে, ওই কথাই রইল। ভালো কথা, ঠিকানাটা বললে না তো?

সুব্রত একটা স্লিপের ওপর ঠিকানাটা লিখে দিল। তার পর সেবার একেবারে কাছে গিয়ে তার কাঁধের ওপর ডান হাতটা রেখে গদ্ গদ স্বরে বললে, সেবু, তোমার ঋণ আমি এ-জীবনে শোধ করতে পারব না।... তুমি না থাকলে আমি যে কি করতুম—সত্যি ভেবে পাই না। তুমি

আমার ডান হাত।

সেবার কান লাল হয়ে উঠল। গালেও রক্তিমাভা দেখা দিল। কোন কথা না বলে ঘাড় নীচু করে নিশ্চলভাবে বসে রইল সে।

সুব্রত তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল, ছোট বয়স থেকে তুমি আমায় সাহায্য করে আসছ। যা করবার আগে সেকথা বুঝে নিয়ে তা পালন করেছ বরাবর। সত্যি, তুমি জানো না, আমিও কতখানি নির্ভর করি তোমার ওপরে। তোমার মত নরম ও কোমল স্বভাবের মেয়েছেলে আমি খুব কমই দেখেছি।

সেবা একগাল হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, হয়েছে? থামলে কেন? আরো যদি কিছু বিশেষণ ও স্তুতিবাক্য জানা থাকে তো বলতে পার।

না-না সেবা, ভুল বুঝো না আমাকে। আমার প্রাণের কথাগুলোই সব বলে ফেললুম—এর মধ্যে অতিশোক্তি নেই এক বিন্দুও।

আর সামলাতে পারে না সেবা নিজেকে, ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে —তার মনের আনন্দটুকু গোপন করতে। সুব্রত তাকে ফাঁকি দিলেও আজ যেটুকু সম্মান দিল, তাই সে যথেষ্ট বলে মেনে নিল মনে মনে।··· কি হবে বিয়ে করে? সে তো জানে সুব্রত তার স্বামী! সুব্রতর সেবায় সে যে লাগতে পেরেছে, সেটাই তার কাছে পবিত্রতম স্মৃতি হয়ে থাক।

সুব্রতর দেওয়া কর্তব্যটুকু সম্পাদন করতে সেবা কোনরকম গাফিলতি করে নি। তার দৈনন্দিন রুটিন-ওয়ার্কের সামিলই ধরে নিয়েছিল সে এটা।

কিন্তু কাজটা সম্পাদন করতে গিয়ে খট্‌কা লাগল তার রতনের সম্বন্ধে। তার আন্দাজ সব সব ঠিক মিলে গেলেও এক জায়গায় সে যেন একটু বিব্রত বোধ করল নিজেকে।···রতনের আকর্ষণী ক্ষমতাটা যেন বড্ড বেশি বলে মনে হলো তার।

রতন তার অমায়িক ভদ্রতার ছদ্মবেশে সেবাকে সুস্বাগতম জানিয়ে অভিবাদন জানালে, আরে, আসুন আসুন, সেবা দেবী। কি সৌভাগ্য আমার!

আমাকে চেনেন আপনি? ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠে সেবা।

কি আশ্চর্য, চিনব না?···আপনি তো আমাদের জামাইয়ের কাছ

থেকে দূতের ভূমিকাভিনয় করতে এসেছেন?

অবাক হয়ে যায় সেবা লোকটার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে। মনে মনে ভাবে, লোকটা কি সর্বজ্ঞ!

অনুমান করতে পারে রতন সেবার বিস্ময়ানুভবটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে। মনে মনে হেসে বেশ মিষ্টি কণ্ঠে বললে, কি হলো সেবা দেবী, এত তাড়াতাড়ি বিস্মিত হয়ে পড়লেন আমার ক্ষমতা দেখে? এখনও তো তা হলে কিছুই টের পান নি!

একটু বিব্রত বোধ করে সেবা। তবুও আপ্রাণ চেষ্টায় সেটুকু সামলে নিয়ে শুকনো হাসি হেসে সুব্রতর কথাগুলো সব জানিয়ে দিল রতনকে এক এক করে।

খুব ভালো ছেলে রতন। অত্যন্ত বাধ্য আর অনুগতের মত এক কথায় রাজী হয়ে গেল সে সে-প্রস্তাবে। মিষ্টি-হাসি হেসে বললে, হাজার টাকা? কোন দরকার ছিল না উপস্থিত এত টাকার। তবে যখন পাচ্ছি—তখন ক্ষতি কি? বেচারা সুব্রত! আমার এখন শ-দুই হলেই চলত।...আপনি আবার যেন গিয়ে এটা তাকে বলে বসবেন না!...যাক্, সর্ত হলো তা হলে, কুন্তলাকে বিরক্ত করতে পারব না আর, আর জামাইবাবু সুব্রতকেও বিব্রত করতে যেতে পারব না, এই তো? রাজী! আমাকে জাহাজে তুলে দিতে কে আসছে তা হলে?

সেবা দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কেন আমি!

আপনি, সেবা দেবী? কি চমৎকার! সত্যি বড্ড খুশি হলুম শুনে।

সেবাও বুঝি মনে মনে অখুশি ছিল না রতনের কথায় ও ব্যবহারে।

আচ্ছা, আপনার তো সুব্রতর সঙ্গে অনেকদিনের জানাশোনা, তাই না সেবা দেবী?

হ্যাঁ, ছোট বয়স থেকে।

আর সে চলতেও পারে না আপনাকে ছাড়া!...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি সব। আর আপনার সম্বন্ধেও সব জানি সেবা দেবী।

তীব্র আপত্তির সুরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল সেবা, কি জানেন?

বিশেষ কিছু না—আপনি অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন...কুন্তলার মুখ থেকেই শোনা—বাত-কে-বাত।

কুন্তলা! কি বলেছে?

কি মুশকিল, কিছু নয় এমন। দোহাই আপনার, এ নিয়ে আবার যেন তাকে বিরক্ত করতে ছুটবেন না। মেয়েটা সত্যিই ভালো—আমাকে বার দুই-তিন কিছু কিছু সাহায্যও করেছে টাকা দিয়ে…

আপনি—আপনি…

সেবা শেষ করতে পারে না তার কথাটুকু, তার আগেই রতন হেসে উঠল হো-হো-হো করে। হাসিটা তার এমনই ছোঁয়াচে যে, সেবাও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারল না।

সত্যিই, আপনার মত অদ্ভুত লোক আমি খুব কম দেখেছি, রতনবাবু। আচ্ছা, মেয়েদের কাছে টাকা চাইতে আপনার লজ্জা করে না?

কি করব বলুন, একটু বেশি খরচে বলেই তো এই বিপদ ঘটেছে। টাকার জন্যে আমাকে কতকগুলো বাজে-বাজে কথাও বানিয়ে বলতে হয়।

আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত আপনার এরকম ব্যবহারের জন্যে।

অত্যন্ত দুঃখিত, সেকথা মানতে রাজী নই আমি। অন্যায় করি, কিন্তু লজ্জানুভব করবার মত অন্যায় করি না।…যাক্ গে সেসব কথা, আমার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত শুনি?

কি রকম? কৌতুহলী চোখে তাকায় সেবা রতনের দিকে।

এই, কতখানি খারাপ আমি, একদম বখে গিয়েছি কিনা…সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সামনে আমি আমার পুরনো ফন্দি-ফিকিরগুলো খাটাতে পারলুম না, যেন কেমন আড়ষ্টতা বোধ করলুম আপনার ওই চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে…মনে হলো দয়ামায়া বলে কিছু নেই আপনার অন্তরে।

মুখখানা কঠিন করে সেবা বললে, আমি আপনার মত লোকদের দয়ামায়া দেখাতে ঘেন্না বোধ করি।

কি অদ্ভুত—সেবা কর যার নাম, তার চরিত্রে এ কি ব্যতিক্রম!

আপনার মত লোকের প্রতি আমার কোন মমত্ব-বোধ নেই।

ভুল, ভুল। আমি দুষ্ট হতে পারি, কিন্তু শয়তান নয়। দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ।

ঠোঁটটা কুঁচকে সেবা অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে বললে, তাই নাকি!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেবা দেবী, তাই। আমার ব্যাপার হচ্ছে—আমি জীবনকে

উপভোগ করতে চাই। করেছিও তা এই বয়সের মধ্যে চূড়ান্তভাবে। তা সে যে কোনও উপায়েই হোক।

রতনকে নির্লজ্জের মত হাসতে দেখে মনে মনে জ্বলে ওঠে সেবা, কিন্তু বাইরে সে ভাবটা প্রকাশ না করে মুখের ওপর শুধু বিরক্তির চিহ্নটা ফুটিয়ে তুলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সে।

কি হলো সেবা দেবী, খুব বেশি অস্বস্তি বোধ করছেন নাকি? কিন্তু তা তো করা উচিত নয়। সুব্রতর জন্যে আপনার এত টান কেন? সে আপনার সঙ্গে একরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেই কুন্তলাকে বিয়ে করল। আপনার ভালোবাসার প্রতিদান সে বেশ ভালোই দিয়েছে, কি বলুন!

আপনি আমাকে অপমান করছেন।

কুন্তলাটা রাম-বোকা। দেখতে সুন্দর হলে হবে কি ঘটে এক কণা বুদ্ধিও নেই। নাহলে সুব্রতর মত ছেলের প্রেমকে সে বুঝতে পারত, তাকে বিমুখ করত না। সুব্রত ভুল করল তো সেইখানে। আপনাকে যদি আজ সে তার জীবনসঙ্গিনী করত, পরিপূর্ণ সুখী হতে পারত সে, আপনিও সুখী হতেন।

আমি অসুখী আপনি জানলেন কি করে?

মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়, সেবা দেবী।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে সেবার, যাক্‌গে, সেকথা আলোচনা করে কিছু লাভ নেই।

কেন নেই? যদি কুন্তলার কিছু ঘটে, যদি সে মারাই যায় ধরুন, সুব্রত কি আপনার কাছে সেই মুহূর্তে ধরা দেবে না!

সেবার মনটা জয় করে নেয় রতন এই ভাবে আস্তে আস্তে। রতনের প্রতি প্রতিবন্ধকতার ভাবটা যেন ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে সেবার মধ্যে থেকে।

রতন খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল সেবাকে। তার নিক্ষিপ্ত শর কতখানি কাজ করল সেটা আন্দাজ করবার জন্যেই তাই বললে আবার, আমার মনে হয় সেটা আমার মত আপনিও বেশ ভালো ভাবেই জানেন।

সেবা সম্পূর্ণ নীরব।

রতন সেবার আরো কাছে এগিয়ে যায়। তার একটা হাত সেবার কাঁধের ওপর রেখে স্নেহকোমল কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, সেটাই সত্যি, আপনার

উচিত আপনার নিজের ওপর আরো বিশ্বাস রাখা। সুব্রতর মত ছেলেকে আপনার কড়ে আঙুলে করে ঘোরাবার ক্ষমতা রাখেন আপনি।

মনে মনে ভাবে সেবা, কথাটা নিছক সত্যি। যদি কুন্তলা তার জীবনে ধূমকেতুর মত এসে সামনে না দাঁড়াত, সুব্রতই কি শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করত না? তার এত ভালোবাসার, নিঃস্বার্থের মত এত সেবার কি প্রতিদান পেয়েছে সে? ওই সর্বনাশী কুন্তলাই তার ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে সমস্ত মুখখানা ক্রোধে লাল টকটকে হয়ে ওঠে সেবার। বোধ হয় সেই মুহূর্তে কুন্তলাকে হাতের কাছে পেলে টুঁটি টিপে ধরত সে।

রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষ্য করতে থাকে সেবাকে আর মনে মনে হাসতে থাকে। পরের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়ে আনন্দানুভব করতে তার জুড়ি নেই আর।

এর পর সেবা ফিরে আসে তার নিজের বাড়িতে। কিন্তু আগের সে সেবা আর নেই। যে-সেবা গিয়েছিল রতনের কাছে, সে আর ফিরে এলো না—যেন সেবার ছায়ামূর্তি ফিরল রতনের কাছ থেকে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, সেবার ফেরার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কুন্তলার ফোন এলো সুব্রতকে আহ্বান করে: কে?...ওঃ, সেবা!...সুব্রত নেই?...হ্যাঁ, বিশেষ জরুরী, আমার বার্থ-ডে পার্টির ব্যাপারেই।...আচ্ছা, তাকে বলো, সে যেন আসামাত্র চলে আসে এখানে।...কি আশ্চর্য, তোমায় বলা হয় নি এখনও?...আমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।...না-না ভাই, তুমি কিছু মনে করো না, সুব্রত নিজে গিয়ে তোমায় ইনভাইট করে আসবে।...ওঃ, আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, কখন্ আসছ?...খুব খুশি হলুম। ছেড়ে দিলুম তা হলে ফোন। বাই-বাই।

টকটকে লাল হয়ে ওঠে সেবার মুখখানা।—কি গুমোর! না হয় বড়লোক আছ তুমি কুন্তলা, তাই বলে এত দেমাক? কিন্তু কাজের বেলায় তো সেবাকে না হলে চলে না? নেমকহারাম, বেইমান! তোমাদের মত স্বার্থপরের ঝাড় যত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায় এই পৃথিবী থেকে ততই ভালো। উঃ!

ফুলে ফুলে উঠতে থাকে সেবা টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে। বড়-

লোকদের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় তার মনের ভেতরটা যেন কেমন করতে থাকে একটা নিষ্ফল আক্রোশে।

সেবার মনের জ্বালাটা এর পর অনেকটা কমে এসেছে প্রকৃতির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ও সময়ের ব্যবধানে। একসময়ে ঘরের মধ্যে শান্তপদে এসে ঢোকে সুব্রত। সেবাকে চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখে মৃদুহেসে সে বললে, চোখমুখ অত ছল ছল করছে কেন কি ব্যাপার?

ফোঁস করে ওঠে সেবা, তোমাদের রকমসকম দেখে সত্যি আমার ঘেন্না ধরে যায় এক-এক সময়ে। কাল বাদে পরশু ফাংশন ওখানে, আমাকে বলবার নামগন্ধ নেই। আমাকে যেচে শেষ পর্যন্ত ইনভিটেশান নিতে হয়, ছি ছি!

কি হলো? তোমাকে বলে নি কুন্তী?

আর ন্যাকা সেজো না। কথায় বলে না—কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী!

সত্যি আমি জানতুম না, ক্ষমা করো।…যাক্ গে, ওধারের খবর কি বলো?

জানি না। অভিমান-স্ফুরিত অধরে ঘুরে বসে সেবা।

আমি ঘাট মানছি—অন্যায় হয়ে গিয়েছে।…আর কি করতে হবে, বলো?

মুখটা ঘোরানো অবস্থায়ই উত্তর দিলে সেবা, তোমার কাজ করে এসেছি। ভদ্রলোক রাজী হয়েছেন।

ওঃ, সেবা, সেবা! হঠাৎ সুব্রত যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আনন্দে। সেবাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে।

ছাড়ো, লাগছে। সেবা মৃদু আপত্তি জানায়, কিন্তু সুব্রতর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করে না।

কেমন মনে হলো রতনকে তোমার—কথা রাখবে তো? সেবাকে আলিঙ্গনাবস্থায় বুকের মধ্যে রেখেই প্রশ্ন করে সুব্রত।

মনে তো হয়। স্বরটা একটু যেন কেঁপে উঠল সেবার।

যাক্, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে ওদিক থেকে।…চলো, বেরোনো যাক্—একটু ঘুরে আসি।

কুন্তলাকে কথা দিয়েছি আমি তার কাছে যাব বলে, সেখানেই চলো।

বেশ তো, তাই চলো। একান্ত খুশিমনে উচ্চারণ করে সুব্রত কথা কটা ক্লান্ত দেহটাকে সোফার ওপর এলিয়ে দিয়ে।

॥ তিন ॥

মনীশ লাহাড়ী সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটের ডগায় চেপে ধরে ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে তাকাল কুন্তলার ফটোটার দিকে, তার পর আপনমনে স্বগতোক্তি করে উঠল, ওঃ, কি কুক্ষণেই দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার কুন্তা—আর একটু হলে সমস্ত জীবনটা অভিশপ্ত হয়ে যেত! তোমার পরীর মত ওই সুন্দর চেহারাটা আর-একটু হলে আমার ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরে করে দিত!

তবুও, ভাবে মনীশ, বড় সামান্য চেষ্টায় হয় নি সেই অভাবনীয় সুযোগ-টাকে সৃষ্টি করতে—কুন্তার ওই অতুলনীয় রূপরাশির মোহে আকৃষ্ট হয়ে তার বাহুপাশে নিজকে আবদ্ধ করতে বড় কম বেগ পেতে হয় নি তাকে। দিনের পর দিন কত লোককে ধরতে হয়েছে, কত জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, কুন্তার কাছে একটিবার পৌঁছবার জন্যে।

কিন্তু কেন সে অমন পাগল হয়ে উঠেছিল, ভাবে এখন মনীশ। নিজের কর্তব্যকাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে সে যতখানি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল কুন্তার কাছে যাবার জন্যে, ঠিক ততখানি কি সন্তুষ্ট হতে পেরেছিল সে সেই মুহূর্তে, যখন সত্যিই পেল সুযোগ সে তার সঙ্গে কথা বলবার, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার!

তবু, সে যা চেয়েছিল, পেয়েছিল পরিপূর্ণভাবে। স্বপনচারিণী কুন্তাকে সে পেয়েছিল তার সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে। তার দুই সুদৃঢ় বাহুপাশে জড়িয়ে ধরবার সুযোগ পেয়েছিল সে তাকে।

কুন্তা?

হ্যাঁ, কুন্তাও পুরোপুরি সুখী হয়েছিল বৈকি তাকে পেয়ে তার বাহুডোরে তাকে বেঁধে। সাময়িকভাবে সেও আত্মবিস্মৃত হয়েছিল বৈকি মনীশের প্রেমডোরে।

কি অপূর্ব নাচত কুন্তা! গলার স্বরে তার কিন্নরীও বুঝি হার মেনে যেত। যেখানে নিয়ে গিয়েছে সে কুন্তাকে, সকলে প্রশংসা করেছে তার রূপের, তার গুণের। মক্ষিকার মত গুন গুন করে ঘুরেছে তারা তার চারপাশে। তার জন্মে সে গর্বানুভব করত, ফুলে ফুলে উঠত তার বুকখানা।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। কারো ভালো লাগে না, ভালো লাগতে পারে না এই ধরনের মেয়েদের বেশিদিন। বড় বেশি চঞ্চলা এরা। ফুলের মধু চেখে চেখে বেড়ানোই এদের পেশা।

ভাবতেও কেমন লাগে সে কথা মনীশের।

কি হয়ে গিয়েছিল কমাস সে ওই কুহকীর পাল্লায় পড়ে! পাগলের মত ঘুরেছে সে ওকে নিয়ে সর্বত্র। যেন আদেখলার মত করে তুলেছিল নিজেকে আর পাঁচজনের চোখে।

হাজারিবাগ থেকে ফেরবার সময়ে কুন্তার সেদিনকার কথাগুলো এখনও স্পষ্টভাবে স্মরণে আছে মনীশের। তার কোলের ওপর শুয়ে পড়ে ছোট মেয়ের মত মিষ্টি-মিষ্টি গলায় বলেছিল সে, মনীশ লাহাড়ী—নামটা বেশ!

কেন, নামটা ভালো লাগল—লোকটাকে লাগল না বুঝি? হেসে বলেছিল মনীশ।

তাই কি বলেছি আমি! দুষ্টুমিভরা চোখে তাকায় কুন্তলা, তবে নামটা বেশ লাগে বলতে ও শুনতে।

মনীশ আল্‌তোভাবে একটা ছোট্ট টোকা কুন্তলার গালের ওপর মেরে ফিস ফিস করে বললে, শুধু দুষ্টুমি!

হ্যাঁগো মশাই, তা তো বলবেই। নামটা কি তোমারও ভালো লাগে না?

কার নাম?

আহা ন্যাকা! তোমার নাম, তোমার নাম—শ্রীমনীশ লাহাড়ী!

বাপ-মার দেওয়া নাম কি খারাপ হতে পারে কখনও? প্রত্যেকেরই কাছে তা সমান প্রিয়।

নিজের দেওয়া নামের চেয়েও?

ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে ওঠে মনীশের, তার মানে?

মানে এমন কিছু শক্ত নয়, ঠোঁটটা উল্টে হাতের নখগুলো দেখতে দেখতে বললে কুন্তলা, মনি বাগচীর চেয়ে মনীশ লাহাড়ী নামটা কি সুন্দর!

মুহূর্তের জন্যে মনীশ যেন কেমন হয়ে যায়। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। সত্যিই অবিশ্বাস্য! অভাবনীয়!

ক্ষিপ্তের মত আচরণ করে বসে মনীশ। একটা হেঁচকা মেরে বসিয়ে দেয় কুন্তলাকে।

ওঃ, লাগে না বুঝি! যন্ত্রণায় কাতরে উঠল কুন্তলা।

এ নাম তুমি কোথায় শুনলে? কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে মনীশ।

কুন্তলা হাসছে। যেন একটা খুব কৌতুকের কথা বলেছে—এইভাবে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বজ্রকঠিন স্বরে প্রশ্ন করল মনীশ আবার, কে বলেছে এ নাম তোমাকে?

এমন একজন যে তোমাকে চেনে। তখনও কুন্তলার মুখে হাসিটুকু লেগে ছিল।

সে কে? এটা একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার কুন্তা, খেয়াল রেখো। আমার জানা দরকার লোকটা কে?

আমারই এক কুখ্যাত পিসতুতো ভাইয়ের মুখে শুনেছি—রতন গুপ্ত নাম। কুন্তলা চোখটা ট্যারছা করে মনীশের দিকে তাকিয়ে বললে।

ও-নামে কোন লোকের সংস্পর্শে আমি এসেছি বলে মনে হয় না।

বোধ হয় সে সময়ে ও নামটা সে ব্যবহার করত না—নিজের ফ্যামিলির প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্যে!

কণ্ঠস্বরটা আপনা থেমে নেমে আসে মনীশের, হুঁ। দেখা হয়েছিল—জেলে সম্ভবত?

হ্যাঁ।...সেদিন রতনদাকে বলছিলুম, তুমি আজকাল এত নীচে নেমে গেছ যে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। সে-কথাটাকে আদৌ গ্রাহ্য করল না রতনদা, উল্টে চড়া গলায় শুনিয়ে দিল আমাকে, তোমার মুখে অন্তত এ কথাটা সাজে না কুন্তী! এই তো সেদিন তোমাকে খুব বেশিরকম মাখামাখি করতে দেখলুম একজন জেলফেরত পাকা ঘুঘুর সঙ্গে। যদিও সে তোমার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছে মনীশ লাহাড়ী বলে, আসলে তার নাম হচ্ছে মনি বাগচী।

মনীশ হাল্কা স্বরে বললে, নাঃ, দেখছি আমার এই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপটা আবার জাঁকিয়ে তুলতে হবে! পুরনো জেল-ঘুঘু তো সব আমরা—আমাদের মধ্যে একতা থাকা দরকার।

কুন্তলা ঘাড় নেড়ে জানালে, বড্ড দেরি করে ফেলেছ প্রিয়, লোকটা সম্প্রতি আবার জেলে গিয়েছে কোন এক রায়বাহাদুরকে চিট করার জন্যে।

তাই বলো! মনীশ নিশ্চিন্ততার একটা শ্বাস ফেলে বললে, তা হলে একমাত্র শুধু তুমিই জানো বর্তমানে আমার ওই গোপন অপরাধ সম্বন্ধে।

আমি কিন্তু সেকথা কাউকে বলতে যাচ্ছি না! হেসে মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে কুন্তলা।

না, বলবেও না সেকথা কোন দিন কাউকে। মনীশের স্বরটা আবার কঠিন হয়ে ওঠে, শোন কুন্তী, জিনিসটা খুব বিপজ্জনক, তুমি নিশ্চয়ই চাও না, তোমার ওই সুন্দর মুখখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ুক! এমন অনেক লোক আছে যারা কোন মেয়ের বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকর্ষণ বোধ করে না একেবারেই এবং তাদের দ্বারাই এই ধরনের নোংরা কাজ হয়ে থাকে। শুধু নভেলে বা ফিল্মেই এরকম ঘটে না—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও ঘটতে শোনা যায় তা।

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মনি?

না, সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে।

কিন্তু কুন্তলা কি সে সাবধান-বাণী গ্রহণ করল? সে কি বুঝতে পারল যে মনীশের ভয়-দেখানোটা একেবারে বাজে নয়? জীবনটা যে শুধু হাসি-ঠাট্টা-আনন্দের নির্ঝর নয়, সেটার পেছনে যে আরো একটা রূপ আছে, আরো একটা জগৎ আছে, সেটা কি অনুধাবন করতে পারল সে?

মনি বাগচী বলে কোন লোকের নাম শুনেছ সে কথাটা ভুলে যাও, বুঝতে পারলে? মনীশ আবার সতর্ক করে দেয় কুন্তলাকে।

কণ্ঠে একটা তাচ্ছিল্যের সুর এনে বললে কুন্তলা, ফুঃ, ওসব তুচ্ছ ব্যাপারকে গ্রাহ্য করি না আমি মনি। আমার মন ওসবের অনেক ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া একজন ক্রিমিনালের সঙ্গে মিশেছি চিন্তা করলে উত্তেজনা বোধ না করে পারি না আমি। তার জন্যে তোমার লজ্জানুভব করার নেই কিছু।

মনীশ অবিশ্বাস্য চোখে তাকায় কুন্তলার দিকে। এত বোকাও হয় মানুষে! সাবধান করে দিলে তা হেসে উড়িয়ে দেয়, সতর্ক করলে তা গ্রহণ করে না—এরকম বোকা লোক আছে পৃথিবীতে, সেটা চোখে না দেখলে বুঝি বিশ্বাসই করতে পারত না সে।

আবারও কঠিন কণ্ঠে সাবধান করে তাকে মনীশ, মনি বাগচীর নাম ভুলে যাও কুন্তলা—আমি বলছি, ও নাম আর মুখে এনো না!

মনে মনে তখনই সংকল্প করে সে, তাকে পালিয়ে যেতে হবে, সরে যেতে হবে কুন্তলার কাছ থেকে কিছুদিনের জন্যে, না হলে আবার হয়তো ওই নাম উচ্চারণ করবে সে, নিজের বিপদ ডেকে আনবে। দৈবাৎ যদি কারো কানে যায়, তা হলে প্রাণ-সংশয় বিপদ হতে পারে ওর।

কুন্তলা তখনও হাসছে মৃদু মৃদু—চোখে বিদ্যুৎ হেনে বললে, অতটা হিংস্র হয়ো না মনি।...এবার কিন্তু আমাকে কাশ্মীরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

আমি থাকছি না এখানে। শিগগিরই একটা কাজে ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছি আমি।

কিন্তু আমার জন্মদিন-পার্টির আগে নয়। তোমাকে আসতেই হবে সেদিন। তুমি ছাড়া আমার উৎসব কানা হয়ে যাবে জেনো।...কথা দাও, আসছ তা হলে?

পারল না ঠেলতে মনীশ কুন্তলার সেই অনুনয়। সম্মতি তাকে দিতেই হলো। ভাবল পার্টির দিন রাত থেকে গা-ঢাকা দিলেই চলবে।

॥ চার ॥

অজয় ভোস রুপালী পর্দার বুকে নতুন চিত্রতারকা মঞ্জু গুপ্তার অভিনয় দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়—চলে যায় বিস্মৃতির অতল তলে, আর এক অসামান্যা রূপসী নর্তকীর স্মৃতি এসে ধাক্কা দেয় তার অবচেতন মনে।

কুন্তীবাঈ!

কি যাদু জানে মেয়েটা! যত বার সে চেষ্টা করেছে, যত ভেবেছে—

আর সে ভাববে না, তার স্মৃতি আর মনের কোণে উঁকি মারতে দেবে না, ততবারই যেন ভেসে ভেসে ওঠে তার রূপরসময়ী অপূর্ব দেহবল্লরীটা চোখের সামনে, পাগল করে দিতে থাকে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশার স্মৃতিটুকু মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠে।

কত মেয়ে এলো গেল তার জীবনে, কিন্তু কই কেউ তো ওরকমভাবে তার সমস্ত মনটা জুড়ে থাকতে পারল না! কেন তবে বাঈয়ের স্মৃতি সে ভুলতে পারছে না, কেন তার স্মৃতি এভাবে মনের মধ্যে উঁকি মেরে পাগল করে তুলছে তাকে!

তবে কি সে সত্যিই ভালোবেসেছিল তাকে?

একটা বাঈজী! তাকে ভালোবাসা!

নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছে সে। ক্ষণিকের মোহে যাকে ভালো লাগে, তাকে চিরজীবনের সাথী করে নেওয়া যায় না!

কিন্তু সত্যিই কি কুন্তীবাঈয়ের প্রতি তার মোহটা ক্ষণিকের ছিল?

ভাবতে চেষ্টা করে অজয়—কি মোহের টানে না পড়েছিল সে সেদিন! পুরীর জনারণ্যের মধ্যে সমুদ্র-তটের ওপরে সেদিন যে অপূর্ব নারী-মূর্তি তার নজরে পড়েছিল, তার বুঝি তুলনা হয় না!…তখন তার অবস্থা সত্যিই অবর্ণনীয় হয়ে পড়েছিল।

এই কি তবে ভালোবাসা! লাভ এ্যাট্ ফার্স্ট সাইট্!

কিন্তু বাঈকে সে ধরে রাখতে পারল কই? তার অত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়েও সে কেন পারল না তাকে তার জীবন-সঙ্গিনী করে নিতে? তার অত আকুতি সে পারল কি করে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসতে? তার সুন্দর সদাহাস্য মুখ, তার টানা-টানা চোখ, তার কোঁকড়ানো একপিঠ চুল, তার হিন্দোলিত অপূর্ব বক্ষ, তার সুঠাম দেহ—সব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারল সে কি করে?

বিস্মিত হয় অজয় নিজের মনেমনেই! মাত্র পাঁচ মাস—পাঁচ মাসের মধ্যেই তার জীবনে ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়ে গেল বাঈ। যেন তার সমস্ত জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছিল বাঈ এই পাঁচটা মাসের মধ্যে। রামধনুর সাত রঙে রঙিন করে তুলেছিল বাঈ তার এই পাঁচ মাসের আয়ুটাকে।

তার দমদমার বাগানবাড়িতে কত দিন গোপনে তাদের মিলন ঘটেছে, আকণ্ঠ পান করেছে সে তার রূপ-রস, তাকে প্রাণভরে ভালো-

বেসেছে সে, জড়িয়ে ধরেছে, বুকের মধ্যে চেপে ধরে তাকে নিষ্পেষিত করেছে।

স্বপ্ন ছিল তা। স্বপ্নঘোরে ছিল সে কমাস।

তার পর ভেঙে গেল সে স্বপ্ন। বড় আকস্মিকভাবে ভেঙে গেল তা যেন। যেন সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আলোর রাজ্যে ফিরে এলো সে।

পূর্ণ মনুষ্যত্ব ফিরে পেল সে আবার। জোর করে ফিরিয়ে আনল তার মনকে বাঈয়ের ওপর থেকে। না-না, বড় বেশি ঝুঁকি নিয়েছিল সে, বড় বেশি জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে বাঈয়ের মোহে। যদি অলকা জানতে পারত, যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ জাগত তার মনে—বাঈয়ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কথাটা যদি একবারও কানে যেত, তা হলে সংসারটা ছারখার হয়ে যেত, মুখ দেখাতে পারত না সে তাদের সমাজে, লজ্জায় মরে যেত সে সে-মুখ দেখাতে ছেলেমেয়েদের। অলকা মেয়েটা ভালো—সাধারণ মেয়েদের মত সন্দেহপ্রবণ নয় সে, তাই সে পেরেছে এত দিন বাঈয়ের প্রেমে মশগুল থাকতে, পেরেছে হাবুডুবু খেতে তার ভালোবাসায়।

একটা স্বস্তির লম্বা শ্বাস টানে অজয়। বাস্তবিক সে আর বাঈ বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিল! ভাগ্য ভালো, তার স্বামী বেচারা এসবের কিছু টের পায় নি। নাহলে কি যে ঘটত কল্পনাও করতে পারে না সে!

বাঈয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই পালিয়ে গিয়েছিল সে এলাহাবাদে—তার শ্বশুরবাড়িতে। বিস্মিত হয়েছিল অলকা, যখন সে বলেছিল তাকে, কদিনের জন্যে এলাহাবাদে বেড়িয়ে এলে হয় না?

সে কি, তোমার কোর্ট তো খোলা রয়েছে!

হ্যাঁ, তা আছে—ভালো লাগছে না কেমন এখানে। দিনকয়েকের জন্যে ঘুরে এলে হতো!

দাঁড়াও, আগে চিঠি লিখি—উত্তর আসুক।

ওরে বাবা, অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না। ইচ্ছে হয়েছে যখন তখন এখনই যাব—আর নয়তো যাব না একেবারেই।···চলো না, একটা সারপ্রাইজ দিই ওঁদের!

তুমি যেন কি, দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ।···ব্যাস, ওই পর্যন্ত, আর কিছু বলে নি অলকা।

তার পরের দিনেই পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে অজয়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল এলাহাবাদের উদ্দেশে।

দিনকতক বেশ ফূর্তিতেই কাটাল সে এলাহাবাদে। যেন মনে হলো অজয়ের, কঠিন রোগভোগের পর আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছে সে।

কিন্তু ভাগ্যে সইল না সে সুখভোগ। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ এক পত্র গিয়ে হাজির কুন্তলার কাছ থেকে।

অজয় যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। এলাহাবাদের ঠিকানা জোগাড় করে এভাবে বাঈ যে পত্রাঘাত করবে—এতটা আশা করতে পারে নি সে।

বিরক্তিতে ভরে উঠল মন। কোন রকমে পত্রটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অজয় বাড়ি থেকে। কাছাকাছি পার্কটায় গিয়ে একটা নির্জন জায়গা খুঁজে বার করে সেখানে বসে পড়ল ও খামের মুখটা ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল।

পত্র তো নয় যেন পাঁজি—পাতার পর পাতা অক্লান্তভাবে লিখে গিয়েছে। পড়তে পড়তে সেই পুরনো মোহটা আবার আস্তে আস্তে তাকে গ্রাস করে ফেলতে লাগল।...তাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে ভালোবাসে, তাকে স্বপ্নে দেখে—মাত্র পাঁচ দিনের বিরহে সে ছটফট করে মরছে। সেও কি সেরকম করে ? ব্যাঘ্ররাজ তার বাঈয়ের জন্যে সেরকম ছটফট করছে ?

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অজয়ের বক্ষ ভেদ করে। সেই পুরনো পরিহাস—বাঘের ছাপের ড্রেসিং-গাউন কিনে দেবার সময়ে যা সে করেছিল। বাঈয়ের বড্ড পছন্দ হয়ে গিয়েছিল জীবন্ত বাঘের সুদৃশ্য ছাপ-যুক্ত ওই ড্রেসিং গাউনটা, তাই সেটা কিনে না দিয়ে উপায় ছিল না। সেটা হাতে নিয়ে সে বলেছিল, দেখো প্রিয়তম, তুমি আবার যেন কোন দিন ওই বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠো না।...তার পর থেকে বাঈ তাকে ব্যাঘ্ররাজ বলেই সম্বোধন করে আসছে।

কি ছেলেমানুষ !

সত্যিই ছেলেমানুষ বাঈ। এমনি মন্দ নয় এরকম পাতার পর পাতা লেখা। কিন্তু তবুও সেটা উচিত হয় নি তার পক্ষে। যদি অলকা টের পেয়ে যায়—তা হলে বিপদ ঘনিয়ে উঠবে—প্রাণসংশয় বিপদ—তার এবং বাঈয়ের। খুব অন্যায় করেছে সে এইভাবে এখানে পত্রাঘাত করে।... বারণ করেছে সে তাকে পত্র দিতে, তবুও সেই কাজ করল সে—মাত্র কটা দিন আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারল না। সে তো ফিরতই

কলকাতায়।...নাঃ, দু-তিন দিনের ভেতরেই ফিরে তাকে এর একটা বিহিত করতে হবে।

আবার আর একখানা পত্র এলো কুন্তলার পরের দিনে। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনেই ফুঁসতে থাকে অজয়। মনে হলো অজয়ের, অলকা যেন কিরকম এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল খামখানার দিকে। কি ভাগ্যি, কোন প্রশ্ন করল না সে, নাহলে সে বোধ হয় দিশেহারা হয়ে পড়ত।

চিঠিটা পাবার পর এক ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অজয় সোজা পোস্টাফিসে গিয়ে হাজির হলো। তার পর সেখান থেকে কলকাতায় কুন্তলার বাড়িতে ফোন করল :

হ্যালো, কে বাঈ?...হ্যাঁ, আমি। এ তুমি কি ছেলেমানুষি করছ? তোমায় না বারণ করে দিয়েছি চিঠি দিতে?

অজয়, প্রিয়তম, কত দিন শুনি নি তোমার ওই স্বর!

কি হচ্ছে, আস্তে—কেউ শুনতে পাবে যে।

না-না, বাধা দিও না আমাকে।...তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে না প্রিয়তম?

হচ্ছে, হচ্ছে। কিন্তু চিঠি আর লিখো না তুমি—এটা ভয়ানক বিপজ্জনক।

আমার চিঠি তোমার ভালো লেগেছে? আমার বিরহ নিশ্চয়ই আর বোধ করো নি চিঠিটা পেয়ে। প্রিয়তম, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় তোমার পাশে উড়ে যাই। তোমারও কি তাই মনে হয় না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যাক গে, ফোন ছেড়ে দিলুম।

আচ্ছা, তুমি এত ভয় পাও কেন? এত সাবধানের কি আছে?

আমি তোমার জন্যেই ভয় পাই বাঈ। আমি চাই না তুমি আমার জন্যে কোন কষ্ট পাও বা বিপদে পড়ো।

কিন্তু আমি আমার জন্যে একেবারেই চিন্তিত নই—সে তো তুমি জানো।

কিন্তু আমি চিন্তিত প্রিয়া।

কবে তুমি আসছ?

সামনের মঙ্গলবারে।

বেশ, তা হলে বুধবারে আমাদের সেই কুঞ্জবনে আবার দেখা হবে

দুজনের মধ্যে।

হ্যাঁ—হ্যাঁ।

প্রিয়তম, এই কটা দিন আমি কাটাব কি করে? তুমি কি কোন রকমে আজকেই চলে আসতে পার না? ওঃ, অজয় অজয়, তুমি ইচ্ছে করলেই পার তা। একবার চেষ্টা করে দেখ না!

না-না, তা হয় না বাঈ।

তুমি বড় নিষ্ঠুর। আমার অর্ধেকের অর্ধেকও মন খারাপ হয় না তোমার আমার জন্যে!

কি বলছ, নিশ্চয়ই হয়।···আচ্ছা, ছেড়ে দিলুম ফোনটা।

অজয় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে ভাবে, মেয়েরা এতখানি মরীয়া হয় কি করে? নাঃ, এর পর থেকে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতটা আরো কমিয়ে ফেলতে হবে।

কলকাতায় ফিরে এলো অজয়। কদিন অনুপস্থিতির দরুণ প্রচুর কাজ জমে গিয়েছিল, সে সব সারতে সারতে হিমসিম খেয়ে গেল সে। তাই বাধ্য হয়ে কুন্তলার সঙ্গে দেখা করাটাও কমিয়ে দিতে হলো তাকে। এক মাসের মধ্যে মাত্র তিন দিনের বেশি ওদিকে মাড়াতে পারল না।

কুন্তলা সেকথা বিশ্বাস করতে চাইল না একেবারেই। অজয়ের সমস্ত অজুহাতকে সরবে নস্যাৎ করে দিয়ে তীব্র আপত্তির সুরে বললে, তোমার সেই একঘেয়ে কথা—মক্কেলের লাইন, তাদের ধরপাকড়—এ সব পুরনো হয়ে গিয়েছে, ওতে আর আমি ভুলছি না। আমার চেয়ে তোমার মক্কেল-রাই কি বড় হলো?

কিন্তু তাদের ফেরাই···

না-না, সেকথা শুনতে আমি চাই না, আমাকে বলো, তুমি আমাকে ভালোবাস কি না—তোমার কাজের চেয়ে আমাকে তুমি বেশি ভালো-বাস কি না।

অজয় বিরক্ত হয় মনে মনে, ভাবে, এ অবুঝকে কিভাবে বোঝ মানাবে সে? তার কাজ, তার ভবিষ্যৎ, তার সামাজিক জীবন আজ কি জলাঞ্জলি দিতে হবে নাকি এই নারীর জন্যে?···কিন্তু সৎসাহসে কুলোয় না অজয়ের সে কথা স্পষ্ট করে বলবার, তার পরিবর্তে শুধুই সে আমতা আমতা

করল, মিউ মিউ করে কাজের অজুহাতটা দিল আর একবার।

কুন্তলা আবদার-মেশানো দৃঢ় কণ্ঠে বললে, তুমি আমাকে আগের মত আর সেরকম ভালোবাস না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

না-না, তুমি বিশ্বাস করো, আমি ঠিক সেরকমই আছি, তোমাকে আগের মতই ভালোবাসি।

ছাই! পুরুষ জাতটা এইরকম বেইমানই হয়। কি করে যে তোমরা ভুলে যাও পুরনো কথাগুলো সব? তুমিই না এক দিন বলেছিলে, আমরা যদি আলিঙ্গনাবস্থায় পরস্পরকে বাহুবন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে মরি কি সুখের মৃত্যু হয় তা? মনে পড়ে সেকথা, আর একদিন তুমি যা বলেছিলে, সাহারার মরুভূমিতে উটের পিঠে চেপে বেড়াতে যাব শুধু আমরা দুজনে —আর কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি, আর ওই নির্বাক জন্তুটা। আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী থাকবে ওপরের ওই নীলাকাশ আর নীচের তপ্ত বালুকণা!...

অজয় ভাবে, প্রেমে পড়লে মানুষ কি গাধায় না পরিণত হয়? কতগুলো বাজে বাজে কথা উচ্চারণ করে সে কি করে সেসময়ে! মেয়েগুলোও সমান অবুঝ—খামকা পুরুষের দুর্বল মুহূর্তের সেই সব কথাগুলো তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিব্রত করে কি লাভ হয় তাদের!

এর পর কুন্তলা হঠাৎ একটা আবদার করে বসল, তাকে নিয়ে অজয় কোথাও পালিয়ে চলুক—পৃথিবীর এমন কোনও প্রান্তে, যেখানে কোন পরিচিত লোকের মুখ দেখতে পাবে না সে, তা হলেই তার আর কোন বাধা থাকব না তাকে প্রাণভরে ভালোবাসার।

তার উত্তরে অজয় তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, পৃথিবীর কোথাও এমন কোনও স্থান নেই যেখানে একদিন-না-একদিন পরিচিত কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না! কে বলতে পারে, হয়তো স্কুল-জীবনেরই কোন-না-কোন বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে সেখানে!

কুন্তলা দমবার পাত্রী নয়, অজয়ের মনে ভীতির উদ্রেক করে সে সহাস্য মুখে বলেছিল তখনই, ঠিক আছে, তার জন্যে কি হয়েছে, কি আর হবে তাতে?

তেতরে ভেতরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল অজয়, বললে, তার মানে, কি বলছে

চাও তুমি?

সেই পুরনো মধুর হাসি হেসে, লাস্যেভরা চটুল চাউনি মেলে তাকায় কুন্তলা অজয়ের দিকে, ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম, কেন তুমি এরকম লুকোচুরির খেলা খেলতে ভালোবাস, বুঝি না আমি! কোন মানে হয় না এর। চলো আমরা একত্রে চলে যাই কোথাও। এই অভিনয়ের পালা শেষ হোক—সুব্রত ডাইভোর্স করুক আমাকে, তোমার বউ ডাইভোর্স চেয়ে নিক তোমার বিরুদ্ধে, তার পর আমরা বিয়ে করে সুখী হই।

শিউরে উঠল অজয়, না বাঈ, তা হয় না, আমি তোমাকে একাজ করতে দিতে পারি না।

কেন—কেন? আমি তো করতে চাই, তোমার আপত্তি কিসের?

মনে মনে ভাবে অজয়, কেন আপত্তি, কিসের আপত্তি—সে তুমি বুঝবে না বাঈ!

কুন্তলা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, আমার মনে হয় পৃথিবীতে ভালোবাসাই হলো সব, কে কি বলল বা কে কি মনে করল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর নেই কিছু।

বাঈ, সেটা আমার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে—পারব না আমি সহ্য করতে আমার সম্বন্ধে সমাজের মধ্যে কানাকানি, লজ্জাজনক আলোচনা। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তুমি অন্য কিছু করবে—আমি সাহায্য করব তোমাকে তা করতে। ব্যারিস্টারি তুমি না-ই বা করলে!

ছেলেমানুষের মত কথা বলো না বাঈ।

তোমাকে কাজই যে করতে হবে তার কি মানে আছে? আমার প্রচুর টাকা আছে—নিজস্ব টাকা, তাই নিয়ে চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি, সুদূর ইউরোপে পাড়ি দি, কিংবা এশিয়ার অন্য কোন জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়ি। খুব সুখে থাকব আমরা সেখানে।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় অজয় কুন্তলার দিকে। ভাবে, কি কুক্ষণেই এই মোহিনীর ফাঁদে পা দিয়েছিল সে! তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মোহিনী এখন তাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে সম্পূর্ণভাবে।

নিমজ্জমান ব্যক্তির মত সেই পুরনো কথাটাই আওড়েছিল অজয় পত্র মারফৎ, তার ও বাঈয়ের ভালোর জন্যেই দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি

হওয়া প্রয়োজন। বাঈয়ের বিবাহিত জীবনে সে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না।...

কুন্তলা কিন্তু সেকথা শুনতে চায় নি। বার বার বিরক্ত করেছে তাকে ফোন করে, পত্র দিয়ে, লোক পাঠিয়ে, নিজে এসে। পাগলের মত বার বার শুনিয়েছে তাকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে—তাকে ছাড়া সে বাঁচবে পারবে না!

একজন বাঈজীকে নিয়ে ঘর করা, তাকে বিয়ে করা—এ যেন স্বপ্নেরও বাইরে অজয়ের। তার সমস্ত ভবিষ্যৎ ধুলোর সঙ্গে মিশতে বসেছে কুন্তলার অন্যায় ও অযৌক্তিক জিদের জন্যে। দাম্পত্য-সুখে সুখী অলকা তাকে ভিন্ন আর অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না—তাকে সে ত্যাগ করবে কি করে? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মহলে সে মুখ দেখাবে কি করে? ছেলেমেয়েরা তার বড় হয়েছে—তারাই বা কি ভাববে তাদের বাপের সম্বন্ধে!

না-না, সে পারবে না তার পরিচিত মহল ছেড়ে যেতে, তার এত বড় প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে পারবে না সে।...কুন্তলার নাগালের বাইরে বেরিয়ে না এসে আর কোন উপায় নেই। যদি প্রয়োজন হয়, যে-কোন ভাবেই হোক, কুন্তলার মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে তাকে।

আগুন জ্বলে ওঠে অজয়ের মাথার মধ্যে চিন্তা করতে করতে। দপ দপ করতে থাকে কপালের শিরাগুলো। কিভাবে তাকে চুপ করানো যায়? তার মুখ বন্ধ করা যায় কি করে? এক ফোঁটা বিষেই কি সে-কাজ সেরে ফেলবে নাকি সে?

ক্রূর দৃষ্টিতে তাকায় অজয় সামনের জ্যামের শিশিটার দিকে। কি করে যেন একটা মৌমাছি ঢুকে পড়েছে ওটার মধ্যে—ক্রমাগত ভন্‌ভন্ ভন্‌ভন্ আওয়াজ করে চলেছে বেচারা শিশিটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে। নিজের সঙ্গে মৌমাছিটার তুলনা করে ভাবে অজয়, আজ তারও অবস্থা অনেকটা যেন ওরই মত হয়েছে—সেও পারছে না ওই মোহিনীর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে!

কিন্তু তাকে, অজয় ভোসকে বেরিয়ে আসতেই হবে। সে হাতের কাছের সুবিধেটাই গ্রহণ করবে।

কুন্তলা ফ্লুর আক্রমণে এখন কাহিল...আর পাঁচ দিন পরেই তার

জন্মদিন পার্টি। সেই উৎসবের পরেই সে তার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চায় ঘর ছেড়ে।…তার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে—একটা বোঝা-পড়ায় আসতে হবে তার সঙ্গে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে কুন্তলা আর তার মুখ খোলবার অবকাশ না পায়!

জলের গ্লাসে কিংবা সোডা ফাউণ্টেনে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে এক ফোঁটা তীব্র বিষ মিশিয়ে দেওয়া—আর মুখ খোলবার অবকাশ পাবে না সে!

এ ছাড়া আর উপায় নেই বাঁচবার।

তীব্র হলাহল হাইড্রোজেন সায়নাইডের এক ফোঁটা তার গ্লাসের মধ্যে—আর, আর একটা ছোট শিশি করে কয়েক ফোঁটা তার ব্যাগের মধ্যে…ব্যস, দেখতে হবে না—ইনফ্লুয়েঞ্জার পর নৈরাশ্য থেকে আত্মহত্যার দিকে প্রবণতা!

গভীর নিশ্চিন্ততার একটা নিশ্বাস ছাড়ে অজয়। সুখচিন্তার আবেশে চোখ দুটো মুদে আসে তার। আত্মতৃপ্তির আনন্দে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে।

॥ পাঁচ ॥

অলকা ভোস তার প্রতিদ্বন্দ্বী কুন্তীবাঈকে ভোলে নি!

সেদিন পুরীর সী-বীচের ওপর সেই অনন্যসাধারণ মোহিনী মূর্তি তার ওপরেও মোহজাল বিস্তার করেছিল বৈকি।

কি একটা কথা বলতে বলতে সে তার মুখ তুলল ও সামনের দিকে তাকাল—সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই মোহিনী মূর্তির ওপর। চোখের পলকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অজয়ের দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল সে—অজয়ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেই মোহিনীর দিকে!

কি হলো বুঝতে পারল না সে, আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল মোহিনীর দিকে। মৃদু হেসে এটা-ওটা কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার খবরটা বেরিয়ে পড়ল তার পর। অলকার মামারবাড়ির সঙ্গে

কুন্তলাদের একটা দূর সম্পর্কের সম্বন্ধ ছিল। খুশিই হলো সে সেই-মুহূর্তে কুন্তলার সঙ্গে পরিচয়টা বেরিয়ে পড়ায়।

কিন্তু সে আশা করতে পারে নি, সেই সাক্ষাতকার শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যই ভাঙতে শুরু করে দেবে। সে আর অজয় তো বেশ সুখীই ছিল! ওই মোহিনীর আবির্ভাবেই না তার সুখস্বপ্নের রবি আজ অস্তাচলগামী!

নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরে অলকা। হ্যাঁ, হাজার বার হ্যাঁ। ওই কুহকিনীর জন্যেই আজ তাদের সুখের সংসার ভেসে যেতে বসেছে। ওই মায়াবিনীর আবির্ভাবের পর থেকেই তার ও অজয়ের মধ্যে একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তাদের মধ্যেকার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বুঝি ভেঙে পড়ে এইবার!

কলকাতায় মাসিমার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়বার সময় অজয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। অজয় তার চেয়ে দু বছরের সিনিয়ার ছিল। কলেজে চার চোখের মিলন হয় যেদিন প্রথম, সেইদিনেই সে অজয়কে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার ভালোবাসার মধ্যে খাদ ছিল না। মনে হয়েছিল তার, অজয়ের ভালোবাসায়ও বুঝি খাদ নেই একেবারে।

ভুল তার প্রথম ভাঙল বিয়ের কয়েকদিন পরেই। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, অজয় ঠিক ততখানি ভালোবাসে না তাকে, যতখানি প্রাণ দিয়ে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে সে তার দয়িতকে। তবুও ভেবেছিল সে, তারই বুঝতে হয়তো ভুল হয়েছে, অজয়ের প্রেম বহির্মুখী নয়—অন্তর্মুখী, তার প্রেমে বাহ্যাড়ম্বর নেই।

কিন্তু সব বুঝি ভেসে যায় এবার। যতই দিন যেতে লাগল, অজয়ের মধ্যে সে একটা ব্যবধান লক্ষ্য করতে লাগল। সে যেন আর আগের মত ততটা আগ্রহশীল নয় তার সম্বন্ধে। কানাঘুষো নানান্ মন্তব্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল তার মনটা।

তবুও হাল ছাড়ে নি সে। আগের চেয়ে বেশি করে ভালোবাসতে লাগল তাকে, তার ক্ষমতানুযায়ী সর্বপ্রকারে তাকে সেবা করে যেতে লাগল। তার দিক থেকে যেন কোন খুঁত না বেরিয়ে পড়ে—তার জন্যে সবসময়ে সজাগ হয়ে রইল। মনকে বোঝাল, সেও যেমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসছে, অজয়ও ঠিক সেই ভাবে তাকে ভালোবাসে।

তার পর তার ভাগ্যাকাশে দেখা দিল কুন্তীবাঈ।

এক-এক সময়ে ভাবে অলকা, গভীর বিষাদের সঙ্গে চিন্তা করে, অজয় কি করে ভাবতে পারল যে, সে কিছুই বোঝে না—কুন্তলার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার কথাটা আন্দাজ করতে পারে না! সে তো ঠিক বুঝতে পেরেছিল, পুরীতেই আন্দাজ করতে পেরেছিল, আস্তে আস্তে কেমন করে কুন্তলা গ্রাস করে ফেলছিল অজয়কে, একটু একটু করে কেমন ভাবে সে তার মোহজাল বিস্তার করছিল অজয়ের ওপর।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। অলকা বুঝতে পেরেছিল তার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুব মত কুন্তলার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। অজয়ের উদাস ভাব তার চোরা চাউনি আরো সপ্রমাণ করে দিল তার দুর্বলতা সম্বন্ধে।

তবুও কোন রকম অসহনীয়তা দেখায় নি সে। তার ভেতরে ভেতরে যে অসহ্য কষ্ট হয়েছে তা বুঝতে দেয় নি সে অজয়কে কোনদিনই। সে রোগা হয়ে গিয়েছে, ভাবনা-চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছে, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তার চেহারা, তবুও সেটুকু ঢেকে বেরিয়েছে অজয়ের সামনে। খাওয়া মুখে রোচে নি, রাত্রির পর রাত্রি জেগে কাটিয়েছে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, তবু তা জানতে দেয় নি অজয়কে।

অজয়কে আঘাত দিতে তার কাজের বিরুদ্ধে, তাকে আপত্তি জানাতে তার ব্যবহার সম্পর্কে বা তার কাছে অনুনয় করতে তার ভালো হওয়ার জন্যে ইচ্ছে হয় নি অলকার—এসব যেন তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

একটা ক্ষীণ আশা মনের মনিকোঠায় মাঝে মাঝে উঁকি মেরেছে তার, হয়তো অজয় ভালো হয়ে যাবে, এই মোহ হয়তো কেটে যাবে এক দিন। মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু নেই, যার জন্যে অজয় তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলবে। আর তা ছাড়া অজয় তো পুরোপুরি ত্যাগ করে নি তার সংস্পর্শ, বাড়ি-আসা তো ছাড়ে নি এখনও। তার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে অন্তত সে ফিরে আসবেই একদিন নিশ্চয়।

কি আছে কুন্তলার মধ্যে? সৌন্দর্য? আকর্ষণ? সে তো অন্য আরো দশটা মেয়ের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। তবে কি দেখে অজয় অমন ভেড়ায় পরিণত হলো?

বুদ্ধিহীন মাথামোটা ছাড়া আর কিছুই নয় সে। পুরুষকে ভোলাতে হলে যে চাতুর্য আর প্রখরতা থাকা দরকার তার কিছুই নেই তার মধ্যে।

শুধু রূপ আর মাকাল ফলের মত সৌন্দর্য থাকলে যে-কোন পুরুষই একদিন হাঁপিয়ে উঠবে—অজয় তো কোন্ ছাড়!

অজয়ের জীবনের ব্রত হচ্ছে তার কাজ—তার বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। যেদিন তার মোহ কেটে যাবে, সেদিনই সে নিজের ভুল বুঝতে পারবে—ফিরে আসবে আবার তার জীবনের সাধনার মধ্যে।

কি প্রখর বুদ্ধি অজয়ের—কি অদম্য উৎসাহ তার কাজে। অলকা জানে এই বস্তু যার মধ্যে আছে, সে কখনও বিপথগামী হতে পারে না। সে-লোককে ছেড়ে যাওয়ার কথাও চিন্তা করতে পারে না সে। পুরুষের এ পদস্খলন কিছুই নয়।

অজয় যখন এলাহাবাদে পালিয়ে গেল কুন্তলাকে এড়াবার জন্যে, সে আশা করল, এবার বুঝি আবার সব স্বাভাবিকতায় এসে যাবে। মাত্র দিনকয়েক নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল সে। কিন্তু রাক্ষুসী স্থির থাকতে দিল না, নিশ্চিন্ত থাকতে দিল না অজয়কে—বিরক্ত করে ব্যস্ত করে আবার টেনে নিয়ে এলো তাকে কলকাতায়।

কি বীভৎস চেহারা হয়ে উঠল অজয়ের! অলকা জানে, কেন এমন হলো? দো-টানায় পড়ে গিয়েছিল বেচারা। মন চাইছে না আর তার পাপিষ্ঠাকে, কিন্তু সেও ছাড়বে না। সমানে অনুনয় করে চলেছে, লোভ দেখিয়ে চলেছে তাকে নিয়ে পালাবার জন্যে—সুদূর দূরপাল্লায় কোথাও পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধবার জন্যে।

কিন্তু সম্ভব হলো না তা। মোহিনীর মোহজাল বিস্তারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। অজয়ের পৌরুষ জেগে উঠল। অলকা জানত যে এমনটা হবে।

তার পরই রাক্ষুসীর হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করল যেন এই অসুখেই সে শেষ হয়, যেন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হতভাগী মরে—আর ভালো হয়ে বিরক্ত করতে না পারে তাদের।

ভগবান শুনলেন না তার সে আবেদন। ভালো করে দিলেন পাপিষ্ঠাকে কয়েকদিন ভোগান্তির পরই। অলকার মন দমে গেল আবার।

তার পরই এলো কুন্তলার জন্মদিন-উৎসব।

ইচ্ছে ছিল না তার সে-উৎসবে যাবার। শুধু কুন্তলার বিশেষ অনু-

রোখেই রাজী হয়েছিল সে। আরো একটা কারণ ছিল প্রচ্ছন্নভাবে মনের মধ্যে—যদি সে না যায়, মোহিনীর জালে যদি আবার জড়িয়ে পড়ে অজয়! হয়তো অজয়ও সেজন্যে চাইছিল অলকাকে সঙ্গে নিয়ে সেই উৎসবে যেতে।

কিন্তু কুন্তলার দিকে তাকিয়ে অলকার মনটা কী একবার চঞ্চল য়ে উঠেছিল? সাংঘাতিক ফ্লুর আক্রমণে বেচারা যেন আধখানা হয়ে গিয়েছিল—কি করে ওই চেহারা নিয়ে ও নাচবে গান গাইবে ভেবেই পেল না অলকা!

কুন্তলাও যেন একটু বেশি খাতির করল অলকাকে হঠাৎ। কি তার উদ্দেশ্য? সে কি ঠিক করে ফেলেছিল তার যাত্রার সব বন্দোবস্ত? অজয়ের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্তটুকু কি হয়ে গিয়েছিল তার অজ্ঞাতে?

চঞ্চল হয়ে ওঠে অলকা। সন্ত্রস্ত ভাবে তাকায় অজয়ের দিকে—কুন্তলার দিকে। সব যেন গোলমাল হয়ে যায় তার মাথার মধ্যে।

হঠাৎ কুন্তলা এসে বসে তার পাশে। এটা-ওটা আলোচনার পর আচমকা জিজ্ঞাসা করে সে, তোমার কাছে এ্যাসপিরিন জাতীয় কিছু আছে অলকা, বড্ড মাথাটা ধরেছে।

কুন্তলা জানত, অলকা ইদানীং মাথার যন্ত্রণার জন্যে এ্যাসপিরিন খাওয়া ধরেছিল।

সে বললে, না ভাই, আমার কাছে এখন ওটা নেই।...তবে অন্য একটা জিনিস আছে। সেটা খেলে একটু ঘুম-ঘুম বোধ করতে পার—তা সেটা কি উচিত হবে খাওয়া ফাংশন শেষ হওয়ার আগেই?

আচ্ছা দাও তো তুমি, কাছে রেখে দিই, যদি দরকার হয়—বলা তো যায় না।

অলকা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে বড়ির মত কি একটা বস্তু কাগজে মুড়ে দিলে কুন্তলার হাতে।

অলকার হাতটা কি একটু কেঁপে উঠল মোড়কটা দেবার সময়ে?

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অলকার একটু দূরে সোফার ওপরে বসা সেবার ওপরে। সেবা মুচকে হাসল।

সেবা কি কিছু অনুমান করল?

তাকাল অলকা সেবার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে। সেবা তখন তার হ্যাণ্ডব্যাগটা

খুলে ব্যাগের গায়ে লাগানো ছোট্ট আর্শিটায় নিজের মুখটা দেখছে ও সামনের দিকের চুলটা ঠিক করে নেবার চেষ্টা করছে।

খানিক পরে আহ্বান জানাল সুব্রত সকলকে ডিনার-টেবিলে। সকলে একে একে এগুলো সেদিকে—কুন্তলার পিছু পিছু।

পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল কুন্তলা। টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দিকে চেয়ে ম্লান মৃদু হাসি একটু হেসে জলের গ্লাসটা তুলে নিল প্রথমে।

তার পর কি ঘটল বুঝতে পারল না অলকা। যেন ঝড় বয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ওলটপালট কাণ্ড ঘটে গেল চোখের নিমেষে। কুন্তলা ঢলে পড়ল চেয়ারের ওপর।...

॥ ছয় ॥

কুন্তীবাঈ...

সুব্রত গ্লাসটা মুখের সামনে থেকে নামিয়ে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকাল সামনের দিকে।

মদে চুরচুরে হয়ে গিয়েছে তার অবস্থা তখন!

না ভালোবেসে পারা যায় না মেয়েটাকে! সত্যিই পাগল করে দেয় ওই কাজল-কালো চোখ দুটো। জানত তা কুন্তলা!

তবুও, মনে হয় সুব্রতর, বোধ হয় বিদ্রূপের চোখেই দেখত তাকে কুন্তী। আশ্চর্য হয়ে ভাবে সুব্রত, তা সত্ত্বেও কি করে সেদিন সে বলতে পারল কথাটা, একবারও বাধল না ঠোঁটের ডগায়, তোমায় আমি ভালো-বাসি, তাই আপনার করে নিতে চাই প্রিয়া, শুধু তোমার বলার অপেক্ষায় রয়েছি। কথাটা হয়তো বলা উচিত হলো না—তুমি আমার মুখদর্শন করবে না আর।...আমি বরাবরই এরকম দুমদাম কথা বলে ফেলি। মানে, আমার মনের কথাটা প্রকাশ করতে চাইলুম আর কি, যদিও জানি সে-সম্ভাবনা আমার ভাগ্যে নেই একেবারে, তবু পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মত কথাটা বলেই ফেললুম।

কুন্তলা হাসল প্রাণখোলা হাসি। কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথাটা

নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে বললে, তোমার কথাগুলো কি মিষ্টি সুব্রত। আমার বড্ড ভালো লাগল। আমি মনে রাখব তোমার এই আবদার, কিন্তু বর্তমানে কাউকে বিয়ে করার কথা এখনো ভাবি নি।

খুব ভালো কথা। তুমি সময় নাও, ভেবে দেখ ভালো করে।...

সুব্রত জানত, তার আশা নেই—কোনও আশা নেই। তাই সে চমকে উঠেছিল, অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়েছিল কুন্তলার দিকে, যখন সে জানাল তাকে বিয়ে করবে বলে।

কুন্তলা যে তাকে ভালোবাসে না, সেটুকু অনুমান করতে পারত সুব্রত। বেশ ভালো ভাবেই জানত তা সে। তাই বুঝি বিস্মিত হয় নি যখন কুন্তলা বলেছিল, তোমার সঙ্গে বিয়ে করায় মত দিলুম কেন জানো, জীবনে স্থিতু হতে চাই, নিরাপদ হতে চাই, শান্তি চাই বলে। ভালোবাসার নামে জ্বর আসে এখন। ওই জিনিসটায় ঘেন্না ধরে গেছে। শুধু তুমি থাকবে আমার পাশে, আর তোমাকে পছন্দ করি—এই কারণেই মত দিলুম এই ব্যবস্থায়। তোমার ব্যবহারটা বড় সুন্দর, কথাগুলো বেশ মিষ্টি, কৌতুকপ্রিয় তুমি, আমাকে মনে করো বিস্ময়জনক —সেই জন্যেই আমার মত পেলে, খেয়াল রেখো।

সুব্রত অসংলগ্নভাবে উত্তর দিয়েছিল, আমরা রাজার মত সুখী হবো রাণী।

একেবারে বাজে কথা বলে নি সুব্রত। চেষ্টা সে করেছিল কুন্তলাকে সুখী করবার সবরকম ভাবে। তার জন্যে নিজেকে যতটা নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব সেটুকু আনতেও দ্বিধা করে নি। জানত সে, এই ধরনের মেয়েরা পুরোপুরি সাধ্বী হয় না, কথা দিলেও কথার খেলাপ করতে তারা সংকোচ করে না—তাই সে কখনও কুন্তলার কোন কাজে বাধা দেয় নি। মনে মনে ভেবেছে, তা হলেই সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক কুন্তলার ছিন্ন হয়ে যাবে।

কুন্তলার মধ্যে একটা ভালো জিনিস লক্ষ্য করেছে সুব্রত, মেয়েটা তাকে ভালোবাসতে না পারলেও পছন্দ করত, আর তার ভেতরের স্বভাবটা যেন মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠত, যেন সে চাইত তার পারিপার্শ্বিক দূষিত আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে।

এই কারণে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিল সে কুন্তলার ওপর, যাতে সে কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু তার পথ থেকে তাকে জোর করে ফেরাবার কথা ভাবে নি সে এক দিনও। যে বয়সের যে ধর্ম, যে পারিপার্শ্বিকতার যে ফলাফল তা থেকে বিচ্যুত করা যায় না একজনকে। কুন্তলার ছোট বয়স থেকে তার স্বভাবের মধ্যে যে দোষটা বেড়ে উঠেছে এত কাল, তা শোধরাবার চেষ্টা করতে যাওয়া বৃথা।

তবু বুঝি সুব্রত সামলাতে পারে না নিজেকে এক দিন। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় অত সাবধানতার পরেও।

সেদিন সে একটু সকাল-সকাল ফিরেছিল অফিস থেকে। কুন্তলা তখন একটা চিঠি লিখছিল কাকে। কোন রকম কিছু সন্দেহ না করে সুব্রত এগিয়ে গিয়েছিল কুন্তলার দিকে। তাকে দেখেই চমকে উঠে কুন্তলা চিঠির ওপরে ব্লটিং-পেপারটা চাপা দিয়ে মুচকি হেসে বললে, ওমা, কখন এলে—টের পাই নি তো। তার পর সুব্রতকে আরো কাছে এগোতে দেখে ব্যস্ত হয়ে রাইটিং-প্যাডটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় সুব্রত প্রথমটা। তার পর সামলে নিয়ে টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্লটিং-পেপারটা তুলে নিল কৌতূহলী হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত রক্ত চন্‌চন্‌ করে মাথায় উঠতে লাগল, যেন মনে হলো সুব্রতর, মাথার মধ্যে কে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে তার চোখ-নাক-কান দিয়ে।

স্বৈরিণী কাকে চিঠি লিখছিল 'আমার প্রাণের প্রিয়তম…' বলে? কে সে স্কাউণ্ড্রেল? যদি এই মুহূর্তে পায় সে তাকে হাতের কাছে—বুঝি টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়ায় তার মাংস। ইচ্ছে করল সুব্রতর ছুটে গিয়ে বিশ্বাসঘাতিনীর টুঁটিটা টিপে ধরে তার ওই কলঙ্কিত জীবনটা শেষ করে দিতে। কাকে পাপিষ্ঠা চিঠি লিখছিল? হতভাগা মনীশ লাহাড়ীকে? বর্বর অজয় ভোসকে? ওই দুটো শয়তানই যেন কয়েকদিন ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল মেয়েটাকে।…

সুব্রতর দৃষ্টি পড়ে যায় হাতের গ্লাসটার ওপর। গ্লাসের ভেতর প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারার ওপর নজর পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। শিউরে উঠল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্লাসটা সজোরে মেঝের ওপর। টুকরো টুকরো

হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরোগুলো চারদিকে।

এ কী হচ্ছে! সে কি পাগল হয়ে গেল? যে চলে গিয়েছে—যার কোনও অস্তিত্ব আর নেই এই মর-পৃথিবীতে, তার বিরুদ্ধে ভেবে ভেবে, সেই স্মৃতির রোমন্থন করে আর কি লাভ?

কুন্তীবাঈ মৃত। শান্তি পেয়েছে সে মরে। সেও আজ শান্তি পেয়েছে। তবে আর কেন অশান্তির সৃষ্টি করা?

শুকনো দেঁতো হাসি হাসল সুব্রত। সে আজ ভাবতে পারল, কুন্তীর মৃত্যু তার কাছে শান্তির প্রতীক!

হা-হা-হা। সেবা কিন্তু জানে না এ-কথা। বড় ভালো মেয়ে সেবা। সত্যি সেবার সেবায় আজ সে বেঁচে রয়েছে। সে তো ভাবতেই পারে না সেবাকে ছাড়া বাঁচত সে কি করে? সে যেভাবে তাকে সাহায্য করেছে, যেভাবে তার সব অসুবিধেয় তাকে প্রাণপণে সহায়তা করবার চেষ্টা করেছে, তার তুলনা বুঝি হয় না—অন্তত কুন্তীর সঙ্গে সেবার কোন তুলনা হয়ই না···

কুন্তী!

সেদিন উৎসবের দিন রাত্তিরে বড্ড বেশি রোগা লাগছিল—জ্বর পরেই যেন কেমন অস্বাভাবিক পাতলা আর রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল বেচারা, কিন্তু তবুও সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা ছিল সে সেদিনকার ফাংশনে। তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে নি কেউ।

তার পর—ঘণ্টা দুই পরে······

না-না, এখন না, সে চিন্তা পরে হবে। এখন নয়, আগে তার প্ল্যান! এখন একমাত্র চিন্তা তার প্ল্যানটা সম্বন্ধে।

গৌতম সেনের কাছে যাবে সে। গৌতম সেন—প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ গৌতম সেন। তার কাছে গিয়ে চিঠিগুলো তাকে দেখাবে সে।

চিঠিগুলো নিয়ে গৌতম সেন কি করবে?···সরলা মালা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। বেচারার কোন ধারণা নেই এই ধরনের ব্যাপার সম্বন্ধে।

হ্যাঁ, এখন সব ব্যাপারটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে সব তার নখদর্পণে।

প্ল্যান। কাজ সব শেষ সেইভাবে। তারিখ? স্থান?

১লা বৈশাখ। নববর্ষের প্রথম দিন। শুভদিন। শিশমহল নিশ্চয়ই—সেই ঘরে, সেইভাবে স্টেজ বেঁধে, সেইভাবে সব আয়োজন করবে সে।

অতিথিরাও সেদিনকার অতিথি কজন। অজয় ভোস, অলকা ভোস, মনীশ লাহাড়ী, সেবা, মালা ও বাকি কজন। গৌতম সেনকে অতিরিক্ত অতিথি হিসেবে দেখা যাবে শুধু।

আর—আর একটা শূন্য চেয়ার থাকবে ডাইনিং-টেবিলে।

কি অপূর্ব প্ল্যান!

নাটকীয়!

পুরনো অপরাধের পুনরাবৃত্তি···

না-না, ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়।

তার মনটা ফিরে যায় কুন্তীর জন্মদিনে···

কুন্তী, ডাইনিং-টেবিলের পাশে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে—মৃত···

॥ সাত ॥

আমার মনে হয়, ওরা যদি না আসত···

অজয় ইজিচেয়ারের ওপর শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল, অলকার গলার স্বরটা কানে অদ্ভুত ভাবে বাজতে, চোখ বইয়ের ওপর থেকে সরিয়ে স্ত্রীর দিকে সাশ্চর্যে তাকাল। মনে হলো অজয়ের, তার মনের কথাটা যেন অন্যের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো। তা হলে অলকাও তার মত ওই বিষয়ে চিন্তা করছে! সেও মনে মনে বুঝতে পেরেছে, সুব্রতর হঠাৎ এভাবে প্রতিবেশী হয়ে আসা খানিকটা উদ্দেশ্যমূলক!

মনের কথাটা তাই বুঝি চাপতে না পেরে বিস্মিত কণ্ঠে বলে ফেলে সে, ঠিক বলেছ অলি, তুমি দেখছি সেটা ধরতে পেরেছ।

হঠাৎ কেমন যেন চুপসে যায় অলকা, উদাসীনভাবে উত্তর দেয়, চেনা-শোনা প্রতিবেশী থাকা ভালো, তবে লোক বুঝে তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহারও করতে হয়—ভালোর সঙ্গে ভালো, মন্দের সঙ্গে মন্দ।

কিন্তু তা কি সম্ভব ?

তা নাহলে এই ধরনের অদ্ভুত পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয় !

নীরব হয়ে যায় দুজনেই।

দুজনেই চিন্তা করছে তখন সকালের ঘটনাটা সম্বন্ধে। সুব্রত এসেছিল তাদের নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু সুব্রতকে যেন ঠিক প্রকৃতিস্থ বলে মনে হয় নি। অজয় ভাবে, বাঈয়ের মৃত্যুর আগে সুব্রত তো এরকম ছিল না! উল্টে সুন্দরী যুবতী বউয়ের একান্ত বাধ্য স্বামীর মতই যেন মনে হতো তাকে। সাদাসিধে, নির্বিবোধী নির্ঝঞ্ঝাটে। এই কারণেই বোধ হয় এই ধরনের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের দ্বারা ঠকে থাকে চিরকাল।

কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয় অজয়ের, তা হলে কি সুব্রত বেশি আঘাত পেয়েছে বাঈয়ের মৃত্যুতে ? নাহলে ওরকম মুষড়ে পড়ল কেন ? কেন অতখানি চঞ্চল আর অস্থির হয়ে পড়েছে সে ?

অনুমান করবার চেষ্টা করলেও পারে না তা অজয়। ভাবে ট্রাজেডিটা ঘটে যাবার আগে বা পরে বিশেষ সংস্পর্শে আসে নি তো তার, সেজন্যেই বোধ হয় আন্দাজ করতে পারছে না। স্মরণ করতে গিয়ে খেয়াল হয় অজয়ের, সত্যিকারের অন্তরঙ্গ পরিবেশে আসে তারা সুব্রতর সঙ্গে মাত্র মাসখানেক আগে, যেদিন সে প্রথম এই পাড়ায় এসে তাদের প্রতিবেশী হিসেবে আস্তানা গাড়ে।

সুব্রতকে তখনই যেন কেমন অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল। ঠিক আগের মত সরল, উদার ও প্রাণখোলা মনে হয় নি। কারণ কি ?

তার পর সুব্রতর আজকের ব্যবহার। এটাও কম রহস্যজনক নয়! ঠিকই বলেছে অলকা, এই অদ্ভুত পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া আমাদের পক্ষে উচিত হলো না।...সুব্রত এই পার্টি দিচ্ছে মালার জন্মদিন উপলক্ষে, কিন্তু মালা কোথায়, সে তো এলো না আমাদের ইনভাইট করতে! অথচ সুব্রত বিশেষ পীড়াপীড়ি করল, কথা নিয়ে গেল, আমরা যাতে উপস্থিত থাকি ওই পার্টিতে। কেন ?

অজয় ভাববার চেষ্টা করে সকালের কথাগুলো আবার।...সুব্রতর অত পীড়াপীড়িতে অলকা যখন বললে, আমাদের আরো দুটো এনগেজমেণ্ট রয়েছে ওই দিনটাতে, তখন সুব্রত যেন বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ঠিক আছে, তারিখটা তা হলে পেছিয়েই দেওয়া

থাক্। মানে, জন্মদিন তো হয়ে গিয়েছে—এটা উৎসব, সুতরাং তারিখটা পেছিয়ে দিলে ক্ষতি হবে না কারুরই। অলকা বিস্মিত হয়ে বলেছিল, সে কি, আমরাই শুধু গেস্ট নাকি—আর কেউ থাকবে না? সুব্রত অস্থির হয়ে দ্রুত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, না-না, আরো গেস্ট থাকবেন, সকলেই আমাদের পরিচিত। তবুও বুঝি অলকা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে নি। একটু বিমর্ষ হয়ে চুপ করে গিয়েছিল। মিনিট দুই পরে, একটু অধৈর্য কণ্ঠে সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল আবার, তা হলে কি সাব্যস্ত হলো? নববর্ষের প্রথম দিনে, না তার পরে? যেদিন আপনাদের সুবিধে হবে—সেই মত তারিখ ফেলব আমি। অলকা উত্তর দিয়েছিল, না, ওই তারিখই থাক্, আর পাল্টাবার দরকার নেই। আমরা বরং অন্য দুটো এনগেজমেণ্ট আগেই সেরে ফেলবার চেষ্টা করব।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অজয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, না-না, আমাদের গিয়ে দরকার নেই এই পার্টিতে।

অলকা মুখটা ফেরাল তার স্বামীর দিকে, চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললে, তা কি করে হয়? কি বলবে তুমি না-যাওয়ার কারণ হিসেবে?

সে যাহোক কিছু একটা বানিয়ে বললেই চলবে।

সুব্রতবাবু শুনবেন না তা। তিনি ঠিক দিন পাল্টাবেন আবার। দেখলে না, আমাদের নিয়ে যাওয়াটাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য?

কথাটা ঠিক, কিন্তু কেন? কেন তিনি আমাদের উপস্থিতির জন্যে এতটা ব্যগ্র?

সেটাই কিছুতে বুঝতে পারছি না। গভীর উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে অলকা, তার পর তুমি বলছ কুন্তলার শিশমহলে হবে এই পার্টি!

আমিও অবাক হয়ে গিয়েছি ব্যবস্থাটা শুনে, বিশ্বাস করো। এত জায়গা থাকতে ওই শিশমহলেই সে পার্টিটা দিতে চাইছে কেন? এতে সমস্ত পুরনো স্মৃতিটাই কি আর-একবার জেগে উঠবে না সকলের মনে?

নিশ্চয়ই সুব্রতবাবু পাগল হয়ে গিয়েছেন কুন্তলার মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে। মুখখানা হাড়িপানা করে বলে অলকা।

আমার মনে হয়, এ পার্টি বর্জন করা উচিত আমাদের। তা হলে আর অপ্রীতিকর ব্যাপারটার সামনাসামনি হতে হবে না।

তা ঠিক। কিন্তু যে অবুঝ লোক, বোঝ মানাতে পারলে হয়।…

একটা কথা কিন্তু মনে পড়ে গেল।

কি কথা আবার?

কথাটা বলেছিলেন সুব্রতবাবু আমাকে একটু আড়ালে। মালা নাকি তার দিদির আকস্মিক মৃত্যুর ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কি যোগাযোগ?

সেটাই বলছি, মালা নাকি শিশমহলের দরজা বন্ধ করে রাখবার হুকুম দিয়েছিল। সে কেন জানি সবসময়ে এড়িয়ে চলতে চায় শিশমহলকে।

অবাক হবার নেই কিছু।

কিন্তু সুব্রতবাবুর মতে এটা নাকি ভালো লক্ষণ নয়। তিনি এ ব্যাপারটা নিয়ে একজন বড় নার্ভ-স্পেশালিস্টের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ধরনের শকের পর রোগীকে সব সময়ে ব্যাপারটার সম্মুখীন করাবে, এড়িয়ে যেতে দেবে না।

বিচিত্র! স্পেশালিস্ট কি চায় যে আরও একটা আত্মহত্যা ঘটুক?

অলকা অধিকতর গম্ভীর হয়ে যায়, শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তিনি আরো বলেছেন, শিশমহলের দুঃস্বপ্নটাকে মালার মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। তার জন্যে সম্ভাব্য সবরকম উপায়েই সে-চেষ্টা করা দরকার।···সুব্রতবাবু নাকি সেজন্যে সেই একই জায়গায় সেদিনকার সেই সব অতিথিদের নিয়েই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

আশ্চর্য, তোমাকে এত কথা বলে গেলেন, তুমি সে-সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কোনও প্রশ্নও করলে না তাঁকে। ধরো, আমরা যারা উপস্থিত থাকব, আমাদের পক্ষেও খুব প্রীতিদায়ক মনে না হতে পারে ব্যাপারটা।

তা ভেবেছি, কিন্তু সুব্রতবাবু যেভাবে ধরলেন আর অনুরোধ করলেন ফাংশনটায় উপস্থিত থাকবার জন্যে, তাতে রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। বিশেষ করে, মালার কথা ভেবেই আমি আর অনর্থক বাদানুবাদ সৃষ্টি করলুম না।

কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা নোংরামোর গন্ধ পাচ্ছি আমি, অলি। আমার যেন কেন মনে হচ্ছে, আমরা আবার একটা গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ব।

মানলুম তোমার কথাটা, তবুও 'না' বলতে পারি না আমরা। সেটা

খুব ভব্যতাসূচক হবে না।

তাই হোক, যখন 'না' বলা যাবে না, আর সেক্ষেত্রে আমন্ত্রণটা পেছিয়ে পড়তে পারে অন্য আর-একটা অনির্দিষ্ট তারিখে, তখন যেতেই হবে, কিন্তু তোমার যাওয়াটা প্রয়োজন কিসে, তা তো আমি বুঝছি না। অনর্থক তুমি উড়ো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। তার চেয়ে শেষ মুহূর্তে বললেই চলবে, হঠাৎ মাথাটা ধরেছে বা ঠাণ্ডা লেগেছে বলে তুমি যেতে পারলে না।

মুখখানা লাল হয়ে ওঠে অলকার। না-না, তা হয় না, সেটা বলতে পারব না, সেটা খুবই খারাপ শোনাবে। তুমি যদি যাও আমিও যাব। আর যদি কোন ঝঞ্ঝাট ঘটেই, আমাদের দুজনে সেটা ভাগ করে নেওয়াও হবে—বিয়েটা আমাদের যাই হোক না কেন।

পাথরে পরিণত হয়ে যায় অজয়। শুদ্ধ অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে। যে-কথা অলকার মুখ থেকে অনায়াসে বার হয়ে এলো, তা যে কতখানি শেলের মত বাজল আর-একজনের বুকে, বুঝি সেটুকু অনুমান করতেও পারল না সে।

একটুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে নিজেকে অজয় বললে, এ-কথার মানে? 'বিয়েটা আমাদের যাই হোক না কেন' কথাটা বললে কেন?

চোখে চোখ রেখে বললে অলকা, কথাটা কি সত্যি নয়?

না, নিশ্চয়ই না। আমাদের বিয়ে আমার কাছে অনেকখানি।

হাসল অলকা, হয়তো তাই—মানলুম তোমার কথা। আমাদের একতা আছে—আমরা সেইভাবেই এবার থেকে কাজ করব…

মানে, ভুল বুঝো না তুমি আমাকে, আড়ষ্ট হয়ে বলে অজয়, আমার কাছে তুমি অনেকখানি, পৃথিবীর যে-কোন বস্তুর থেকে প্রিয়, তোমায় ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

অকস্মাৎ অলকাকে অজয় আকর্ষণ করে নিজের দিকে, তার পর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমোয় চুমোয় পাগল করে তোলে।… অলি, অলি, রাণী আমার, তোমায় আমি ভালোবাসি, দুনিয়ায় সবথেকে প্রিয় তুমি আমার……কিরকম একটা অজানা ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলুম কদিন—ভয় ছিল বুঝিবা তোমাকে হারাই…

অলকার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে যায়, কুন্তলার জন্যে?

সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গন শিথিল হয়ে যায়। গভীর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে অজয় কোন রকমে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

নীরব দুজনেই। কারো মুখে কথা নেই।

তুমি জানতে সব—কুন্তলার সম্বন্ধে? সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে অজয় একটু পরেই।

নিশ্চয়ই—গোড়া থেকে।

আমার অভিনয় তুমি ধরতে পারতে?

মুহূর্তের মধ্যে কথার মোড ঘুরিয়ে দেয় অলকা, না, ঠিক তা নয়, মানে ভাসা-ভাসা বুঝতুম আর কি—তুমি কি ওকে ভালবাসতে?

না-না। আমি ভালোবাসি শুধু তোমাকেই।

মুখটা ঘৃণায় বিকৃত করে বলে উঠল অলকা, এই কিছুক্ষণ আগে থাকতে, না? ছি ছি, লজ্জা করল না তোমার এই মিথ্যে কথাটা বলতে! তুমি জেনেশুনে এমন মিথ্যে কথাটা বলতে পারলে কি করে?

অলকার ভর্ৎসনায় ক্ষুণ্ণ হয় না অজয়, বরঞ্চ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দেয়, হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে বটে, কিন্তু অন্তভাবে যদি ধরো দেখবে একবর্ণও মিথ্যে নয় এর। আমার কাছে এইটাই সত্যি। এমন অনেক লোক আছে এই পৃথিবীতে, যারা বাইরে দেখায় খুব ভালো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত হীনস্তরের লোক তারা। যখন তাদের নিষ্করুণ হওয়ার দরকার হয়, তখনই তারা সাধুতার ভান করে থাকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তাদের মত ভণ্ডরা মনে করে থাকে, তারা যেসব কাজ করে তার মধ্যে স্বার্থপরতার লেশমাত্র গন্ধ নেই। কিন্তু এই ধরনের ঠিক উল্টো লোকও যে আছে পৃথিবীতে সেটাও তোমার জানা দরকার। তা যদি না থাকত, তা হলে আজ অন্যরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো তোমাকে।

তিক্তকণ্ঠে বলে অলকা, কিন্তু আমাকে তুমি ভালোবাসতে পার নি কোন দিনই।

সত্যি, আমি ভালোবাসতে পারি নি এ পর্যন্ত কাউকেই। মনে মনে ভেবেছি আমি, যে-বস্তুর পেছনে ছুটেছি সেটাই বুঝি ভালোবাসা, কিন্তু পরে সে-ভুল ভেঙে গিয়েছে। ব ঈয়ের পেছনেও ছুটেছিলুম অন্ধের মত, নিজেকে অবিশ্বাস্য ক্ষুধার্ত বোধ করেছিলুম, তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম তার ওপর পাগলের মত, কিন্তু সে-মোহ কেটে গেল, কদিন পরেই হাঁপিয়ে

উঠলুম। তার প্রতি আমার অমন অন্ধ অনুরাগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল!

এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে বললে সে আবার, বোধ হয় দয়াময় ভগবান আমায় সত্যপথের সন্ধান দিলেন।

সত্যপথের সন্ধান?

হ্যাঁ, সত্যপথের সন্ধান। ভুল পথ থেকে ঠিক পথে চলার দিব্যদৃষ্টি দান।...আমার জীবনের একমাত্র সত্য তুমি—এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ততা।

ওঃ, জানতুম না তা আমি। বিড় বিড় করে বলে অলকা অন্যদিকে তাকিয়ে।

তুমি কি জানতে?

আমি জানতুম, কুন্তলাকে নিয়ে পালাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছ তুমি!

বাঈকে নিয়ে? হা-হা-হা করে একপ্রস্থ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল অজয়। তার পর বললে, তা হলে ক-বছর শ্রীঘর বাস করতে হতো!

কি করতে হতো তা তুমিই জানো।...কুন্তলা বলে নি তাকে নিয়ে পালাবার জন্যে?

হ্যাঁ বলেছিল, অস্বীকার করছি না।

কী হলো?

যা হবার—বাঈয়ের মৃত্যু!

স্তব্ধ হয়ে যায় দুজনেই। দুজনেরই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপূর্ব সুন্দরী মোহিনী-মূর্তি একটি রমণীর বীভৎস মৃতদেহ—দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে মাটির ওপর।

একটু পরে একটা আকুল স্বর বেরিয়ে এলো কণ্ঠ অজয়ের ভেদ করে, অলি, প্লিজ, ভুলে যাও, দয়া করে আর ওই স্মৃতিটা মনে করিয়ে দিও না।

কিন্তু তুমি ভুলতে চাইলেও, ভুলতে আর দিচ্ছে কই, আবার সেই স্মৃতিই তো পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা চলেছে!

আবার স্তব্ধতা। এক মিনিট কারো মুখে কোন কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত অলকাই কথা বললে, তা হলে আমরা কি করব?

এই কিছুক্ষণ আগে যা বললে তুমি—যে-কোন ঘটনার সম্মুখীন হবো

দুজনে একত্রে। যত বীভৎসই হোক না পার্টির উদ্দেশ্য, আমরা যাব সেখানে।

মালা সম্বন্ধে সুব্রতবাবু যে কথাগুলো বলে গেলেন তুমি তা হলে বিশ্বাস করো না একেবারেই ?

না। তুমি করো ?

হয়তো সত্যি হলেও হতে পারে। তবে ওটা সত্যি হলেও, পার্টির আসল কারণ অন্য বলে অনুমান হয়।

আসল কারণটা কি বলে মনে হয় তোমার ?

কি করে বলব আমি তা ? তবে আমার কেমন ভয়-ভয় করছে।

সুব্রতবাবুর সম্বন্ধে ?

হ্যাঁ, আমার মনে হয়—সে জানে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে অজয়, জানে কি ?

মাথাটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে অজয়ের সামনাসামনি এনে তার চোখের ওপর চোখ রেখে ফিস ফিস স্বরে বললে অলকা, ভয় পাব না আমরা। সাহস সঞ্চয় করব—পৃথিবীর সমস্ত সাহস একত্র করে যাব সেখানে। স্মরণ রেখো, তোমার সামনে এখনও জীবনের অনেক বাকি—তোমাকে আরো বড় হতে হবে, বিরাট হতে হবে, তোমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে।

অলি, এ পার্টিটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?

আমার মনে হয়, এটা একটা ফাঁদ।

আর আমরা জেনেশুনে তার মধ্যে পা দেব ? করুণস্বরে প্রশ্ন করে তাকায় অজয় অলকার মুখের দিকে।

এটা ফাঁদ বলে ধরতে পেরেছি তা জানতে দেওয়া চলবে না কোনক্রমেই।

বেশ।

হঠাৎ অলকা মাথাটা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর ক্রুর হাসিতে ফেটে পড়ে বললে, তোমার যা খুশি করতে পার কুন্তলা, যত সাংঘাতিকই হও না তুমি, করতে পারবে না কিছুই। পরাজয় তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

অজয় ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলল তাকে, তার পর দুটো হাত তার দু গালের ওপর রেখে মুখটা নিজের মুখের সামনে তুলে

ধরে বললে, অলি, অলি, শান্ত হও। বাঈ আর নেই, মারা গিয়েছে সে, শান্ত হও তুমি।

তাকালো অলকা স্বামীর দিকে। দৃষ্টি তখনও তার উদভ্রান্ত। উদাস-কণ্ঠে বললে, ওঃ, তাই বুঝি, কিন্তু মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো—মনে হয়, জীবন্ত হয়ে সে আমার দিকে কিরকম এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, যেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আমাকে ভস্ম করে দিতে চাইছে। উঃ মাগো।

॥ আট ॥

নিউমার্কেট থেকে বেরুবার মুখে মালা বললে, জামাইবাবু, আমি এখন মলয়ার বাড়ি যাব। আপনাকে তার আগে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে জানাবেন।···পঞ্চম এই কদিন ধরে কামাই করে এমন মুশকিলে ফেলেছে যে কি বলব!

না-না, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। আমায় তুমি এখান থেকেও ছেড়ে দিতে পার।

আপনি এখন কোথায় যাবেন?

একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব শ্যামবাজারে। সাতটার সময়ে এনগেজমেণ্ট আছে।

ঠিকানাটা যদি জানান, ফেরবার সময়ে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারি।

তার দরকার হবে না। আমার কাজ কখন সারা হবে তার তো ঠিক নেই, তুমি বরং সোজা বাড়ি ফিরে যেও।

বেশ, তা হলে চলি। নটার মধ্যেই ফিরব, কেমন? খুশিতে ঝলমল হয়ে মালা তখনই গাড়িতে উঠে বসে ও স্টার্ট দিয়ে চোখের নিমেষে বেরিয়ে যায়।

সুব্রত এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে উল্কার মত ধাবমান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

গাড়ি চালাতে চালাতে আপন মনে হেসে ওঠে মালা, ভাবে জামাই-বাবু লোকটা সত্যিই সরল। কোন কিছু সন্দেহ না করে কেমন ছেড়ে দিল তাকে!

পরমুহূর্তে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বিমনা হয়ে যায় সে, যদি না দেখা পাওয়া যায় মনীশের, আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল—রেষ্টুরেণ্টে একজন একজনের জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে পারে!

একটু পরেই তার অমূলক ভীতিটা চলে গেল ফারপোর সামনে এসে। মনীশকে উদ্বিগ্ন মুখে গাড়িবারান্দার তলায় অপেক্ষা করতে দেখে মনে মনে ব্যথাই অনুভব করে সে।

চেনা মোটরের পরিচিত হর্নের আওয়াজে মনীশ মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চার চোখের মিলন হলো। সঙ্গে সঙ্গে হাতাছানি দিয়ে ডাকল তাকে মালা।

বিপরীত ফুটপাথে অপেক্ষমান মোটরের মধ্যে দ্রুত উঠে বসে মনীশ বললে, এত দেরি করলে?

কি করব, জামাইবাবু সঙ্গে ছিলেন যে!

হোপলেস। তোমার এই জামাইবাবুটি দেখছি আমাদের জীবনের সব আনন্দটুকু নষ্ট করে দেবে!

না-না, ওকথা বলো না। জামাইবাবু আর তো কোন বাধা দিচ্ছেন না বা তোমার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলেনও নি আর!

তা হয়তো বলেন নি, কিন্তু তুমিই বলো না—আমাদের স্বাভাবিক মিলন সম্ভব হচ্ছে কি? তোমাদের বাড়িতে আমি যেতে পারছি কি? আমাদের দেখা-সাক্ষাত হচ্ছে বটে, কিন্তু তা চোরের মতন!

আর কটা দিন অপেক্ষা করো, লক্ষ্মীটি। মনে হচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে এবার।

মনে হচ্ছে! বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলে ওঠে মনীশ, এখনও মনে হচ্ছে? আমার কিন্তু সব ব্যাপারটার মধ্যে কেমন একটু গোলমাল ঠেকছে।

কি রকম?

পরে বলব, এখন না।

কেন এখন বলতে আপত্তিটা কিসের?

আছে, সে তুমি বুঝবে না।

যাক্ গে, কাল তুমি বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসো—চায়ের নেমন্তন্ন রইল তোমার।

ওরে বাবা, মাপ করো, এখন না।

সবেতেই এখন না! কি ব্যাপার বলো তো তোমার?

সব জায়গায় যেতে রাজী আছি, শুধু তোমাদের বাড়ি ছাড়া। ওইখানে আতিথ্য-গ্রহণেই আমার আপত্তি!

কেন? কিসের জন্য?

তোমার জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করো।

কিন্তু জামাইবাবুর তো বাড়ি নয়। এখন ও-বাড়ির কর্তা আমিই।

অস্বীকার করছি না আমি, তবুও যেতে পারব না।

কেন?

বলতে পারব না। মাপ করো মলি, সেকথা ছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করো।

ক্ষুণ্ণ হলো মালা মনে মনে। অভিমান-স্ফুরিত অধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি যেন বলবে বলেছিলে আজ, বলবে কি?

নিশ্চয়। খুব জরুরী ব্যাপার সেটা এবং তা বলব বলেই ঠিক করে রেখেছি মনে মনে।

মিনিটখানেক নিস্তব্ধতায় কাটল। মনীশ যেন প্রস্তুত হতে থাকে ভেতরে ভেতরে কোন কঠিন কিছু শোনাবার জন্যে। তার মুখেচোখে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়প্রত্যয়ের ভাব একটা ফুটে ওঠে।

কই বলো! অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে মালা।

সত্যি কথা বলবে তো মলি, আমাব প্রশ্নটার সঠিক উত্তর পাব··· তুমি আমায় বিশ্বাস করো?

মালা যেন থতিয়ে যায়। মনে মনে সে যা ভেবেছিল, সেরকম কোন প্রশ্ন নয়।

আড়চোখে তাকিয়ে মালার মনের কথাটা আন্দাজ করতে পারে মনীশ। কাষ্ঠহাসি হেসে তাই বলে, তুমি হয়তো আশা করো নি, আমি এই ধরণের প্রশ্ন হঠাৎ করে বসব! কিন্তু মলি, এটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং আমার কাছে এই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হচ্ছে এটা। আমি আবার জিজ্ঞেস করছি তোমাকে,

আমাকে বিশ্বাস করো তুমি ?

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে উত্তর দিলে মালা, কেন করব না, নিশ্চয়ই করি।

তা হলে এবার তোমাকে একটা অনুরোধ করব, আর সেটা তোমাকে রাখতেও হবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো মালা মনীশের দিকে।

আমরা কাল সকালে রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে বিয়েটা সেরে ফেলব—কিন্তু খুব গোপনে, কেউ টের পাবে না তা এখন।

নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মালা মনীশের দিকে।

উত্তর দাও মলি!

ক্ষমা করো আমাকে, আমি পারব না তা।

আমাকে বিয়ে করতে পারবে না ? কি বলছ ?

ওভাবে চোরের মত লুকিয়ে কিছু করতে পারব না।

তবু তুমি আমায় ভালোবাস, বার বার বলেছ আমায় ছাড়া আর কাউকে তুমি বিয়ে করবে না!

এখনও বলছি, তোমায় আমি ভালবাসি, সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি।

তবুও তুমি আমার সঙ্গে রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে এই কাজটুকু সেরে আসতে পারবে না ? বিচিত্র! বিয়ের লোক-দেখানো ভড়ংটা তো পরে সারলেও চলতে পারত।

কি করে হয় তা ? আমি এ ধরনের কাজ করব কি করে ? জামাই-বাবু মনে মনে ভীষণ আঘাত পাবেন। তা ছাড়া আমি সম্পত্তি পাই নি এখনও। একাজ যদি করি, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারি। আর আমার বয়স তো এখনও আঠারো বছর হয় নি—আমি এখনও নাবালক আইনের চোখে।

তোমায় মিথ্যে কথা বলতে হবে, বয়সটা লুকিয়ে তোমায় বলতে হবে তুমি সাবালক হয়ে গিয়েছ। · আচ্ছা, তোমার অভিভাবক কে এখন ?

জামাইবাবু। জামাইবাবু আমার প্রপার্টির ট্রাস্টিও একজন।

সে যাই হোক, আমাকে এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে। অভিভাবকের বিনানুমতিতে নাবালিকাকে বিয়ে করার জন্যে যদি ভবিষ্যতে কোন শাস্তি

পেতে হয়, তাও মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি, তবু বিয়েটা ফেলে রাখতে চাই না। কারণ কি জানো? একবার যদি বিয়েটা সেরে ফেলতে পারি, তখন হয়তো আর নাকচ হতে নাও পারে।

তীব্রভাবে ঘাড়টা দুলিয়ে দৃঢ় আপত্তির স্বরে মালা বললে, না-না, তা পারব না আমি। এতখানি অকৃতজ্ঞ বেইমান হতে পারব না আমি। আর তা ছাড়া, কেন, কিসের জন্যে এত তাড়াহুড়ো?

ঠিক এই কারণেই গোড়ায় বলেছিলুম, তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারবে কিনা, বিশ্বাস করো কিনা। আমি যাই বলি না কেন, তোমার সেটা সরল বিশ্বাসে মেনে নিতে হবে। ভালো ছাড়া কখনই মন্দ করবার চেষ্টা করব না আমি তোমার—এ কথাটা সর্বদা স্মরণে রেখো।

শান্ত গলায় মালা বললে, বেশ তো, জামাইবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলো না। আমি তোমার পক্ষে রইলুম জেনো। যদি আমার মতামত চান জামাইবাবু, তা হলে তা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন।

হ্যাঁ, তা তো জানি, কিন্তু···

কিন্তু আবার কি, তুমি আমার সঙ্গে চলো আমাদের বাড়িতে—সেখানে আমার সামনেই কথাবার্তা হতে পারবে ··

হ্যাঁ, তা পারবে, চিন্তিত কণ্ঠে বলে মনীশ, তোমাদের বাড়িতে এখন বোধ হয় অন্য গেস্ট থাকতে পারে, ঠিক এই সময়ে সুব্রতবাবুকে বিরক্ত করতে যাওয়া উচিত হবে না।

অন্য গেস্ট? ভ্রূ কুঁচকে বলে মালা, না-না, কোন গেস্ট কেউ থাকবে না এখন। জামাইবাবু নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন আর একলা থাকবেন, আমি জানি।

তুমি কিছু জানো না, ডিটেকটিভ গৌতম সেনের যাওয়ার কথা আছে তোমাদের বাড়িতে···

গৌতম সেন? মনীশের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সাশ্চর্যে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে মালা, গৌতম সেন এসময়ে যাবেন, তুমি কি করে জানলে? কই, আমি তো তার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না।

আমাদের জানতে হয় মলি। শুধু তাই নয়, গৌতম সেন পরশুর ফাংশনে উপস্থিত থাকবেন এবং তার ব্যবস্থা ইত্যাদি করবার জন্যেই ভদ্রলোক আজকে হয়তো তোমাদের বাড়িতে যাবেন একবার।

কি আশ্চর্য, জামাইবাবু এ-কথাটা চেপে গেছেন তা হলে আমার কাছে।

তাই হয় মণি। সেই জন্যেই আমি বলছিলুম, তুমিও যদি একটা কাজ করে ফেলো গোপনে, তা খুব অন্যায় হবে না। আর তা ছাড়া সেটা সত্যসত্যিই গর্হিত বা খারাপ তো নয় কিছু।

মালার কানে মনীশের কথাগুলো আর ঢোকে না। মনে মনে কিসের যেন এক গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়েছে সে তখন। মুখেচোখে সেটার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠে।

মনীশ একাগ্র দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নমুখে অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু পরে আচমকা প্রশ্ন করল মালা, আচ্ছা, তোমার কি একবারও মনে হয়েছে দিদি আত্মহত্যা করে নি—কেউ তাকে হত্যা করেছে?

ভূত দেখার মত চমকে ওঠে মনীশ, এটা আবার তোমার মাথার মধ্যে ঢোকালে কে?

মনীশের কথার সোজা উত্তর না দিয়ে মালা তার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল আবার, একবারও কি মনে হয় নি তা তোমার?

আরে না-না, কুন্তী যে আত্মহত্যা করেছে সেটা তো সকলেই জানে।

চুপ করে যায় মালা।

এসব উদ্ভট কথা কে বলেছে তোমায়? মনীশই অধৈর্য হয়ে একটু পরে জিজ্ঞাসা করে ওঠে।

মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে মালা সুব্রতর নাম ও তার মুখে শোনা সব কথাগুলো বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে অতি কষ্টে। তার পর একান্ত শান্ত গলায় উদাস কণ্ঠে শুধু বললে, না, এমনি মনে হলো, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।

মালাকে নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করে বলে ওঠে মনীশ, দূর পাগলী! ওসব চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে ফেলো। এখন শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—এটাই হবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতকে ভুলে যাও, মুছে ফেলো তাকে মন থেকে একেবারে।

মালা কিন্তু মনীশের কথায় সায় দিতে পারে না। কেমন যেন একটা স্বার্থপরের গন্ধ পায় সে মনীশের এই উক্তির মধ্যে। তাই মনীশের এই

আলিঙ্গনটাও ভালো লাগে না তার। একটু বিরক্ত হয়েই নিজেকে কৌশলে মুক্ত করে আনল সেই নিবিড় বেষ্টনীর ভেতর থেকে।

॥ নয় ॥

ভিজিটিং কার্ডটা হাত বাড়িয়ে নিল গৌতম নকুডের কাছ থেকে। তার পর তার ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, ওঃ, আচ্ছা, বসা গে যা বাবুকে ড্রইং-রুমে, আমি যাচ্ছি।

নকুড ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাকুল হয়ে পড়ে গৌতমের মুখখানা।

সুব্রত রায়!

কিন্তু কেন সে দেখা করতে চায়? কি তার উদ্দেশ্য?

সুব্রতকে বেশ ভালোভাবেই চেনে গৌতম। পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত রায় বংশের ছেলে এই সুব্রত। যদিও এখন আর তাদের পূর্বেকার সেই বাড়-বাড়ন্ত নেই, তবু পিতৃ-পিতামহদের দৌলতে যেটুকু অংশাবশেষ এখনও আছে, সেটুকুও নাড়াচাড়া করে খেতে পারলে মোটামুটি স্বচ্ছন্দে চলে যাবে তার জীবনটা।

সুব্রত ভালো চাকরি করে বলেও সে শুনেছে। গভর্নমেন্টের একজন গেজেটেড অফিসার সে।

কিন্তু ছেলেটা বড্ড বোকা-বোকা টাইপের। পার্টি বা ফাংশনে এ পর্যন্ত যতবার দেখেছে সে তাকে, ততবারই মনে হয়েছে তার, বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু নেই সুব্রতর ঘটে।

না হলে এমন কাজ করে কেউ? একজন বাঈজীকে বিয়ে করে সংসারী হবার কথা চিন্তা করতে পারে কেউ?

কুন্তীবাঈ মেয়েটা ছিল ভালো, কিন্তু সঙ্গদোষে সে আর ভালো থাকতে পারল কোথায়? ভালো ঘরের ভালো মেয়ে কিভাবে যে নষ্ট হয়ে গেল তার চোখের সামনে তা ভাবতেও কষ্ট হয় গৌতমের।

সেই মেয়েকে বিয়ে করে সুখ-স্বপ্নের চিন্তা করেছিল সুব্রত। কিন্তু

কি মারাত্মক ভুলই না করেছিল সে! শুধু রূপ আর বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ জীবনে সময়ে সময়ে কতখানি ভুল করে বসে—তার প্রমাণ এই সুব্রত রায়।

বেচারা! গৌতমের অন্তর ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে সুব্রতর ব্যর্থ জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় সে ও ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়ায়।

গৌতমকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও হাত তুলে নমস্কার করল তাকে।

বসুন, বসুন, দাঁড়ালেন কেন! গৌতম সহাস্যমুখে প্রতি-নমস্কার করতে করতে বললে।

সুব্রতর চেহারায় আগের আর সেই জৌলুস নেই। সুন্দর সুশ্রী চেহারাটা যেন কেমন কালচে মেরে গিয়েছে। চোখের কোলে এক পোঁচ কালি পড়েছে। শীর্ণ হয়ে গিয়েছে দেহটা অনেকখানি। কপালের ওপর লম্বালম্বিভাবে বিশ্রী টানা টানা দাগ বেরিয়ে তার চিন্তাকুল হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে।

আপনার সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্ট ছিল…। আমতা আমতা করে বলে সুব্রত।

হ্যাঁ, বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি আমি?

আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে ঘোষিত হলেও আমার সন্দেহ হয় ব্যাপারটা ঠিক তা নয়!

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গৌতম সুব্রতর দিকে। ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে উঠল তার, কেন, এরকম সন্দেহ হবার কারণ কি আপনার?

এই চিঠি দুটো পড়ুন। সুব্রত পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিঠি দুটো বার করে গৌতমের প্রসারিত হাতের ওপর দিল।

হুঁ, বেনামা চিঠি!

হ্যাঁ। আমার যেন কেমন মনে হয়, লেখক সত্য কথাটাই জানাতে চেয়েছে এবং তা আমি বিশ্বাসও করেছি।

না-না, ঠিক কাজ করেন নি! এ ধরনের বানানো চিঠি, সত্যকে বিকৃত করে ভয়-দেখানো পত্র প্রায় সময়েই পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুটাকে বিকৃত করে আপনাকে বিব্রত করার

হয়তো লোকের অভাব নেই—আর সেটাই স্বাভাবিক আমায় মনে হয়…

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কুন্তলার মৃত্যুর দীর্ঘ সাত মাস পরে এই চিঠি পেলুম আমি। যদি কিছু খারাপ মতলবই থাকত কারুর, সে কুন্তলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা দিতে পারত।

হ্যাঁ, তা হয়তো ঠিক—আচ্ছা, কে লিখতে পারে এ রকম পত্র আপনার মনে হয়?

তা আমি কি করে বলব? তবে যেই লিখে থাকুক—তার জন্যে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কুন্তলার মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—পত্র লেখকের এই খবরটুকুই সাংঘাতিক এবং সেটাই আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কেন এরকম ধারণা হলো আপনার? আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর আগে বা ঠিক পরেই কি সন্দেহটা জেগেছিল একবারও মনে? যদি জেগে থাকে, কেন জাগল? পুলিসের মনেই বা সন্দেহটা জাগল না কেন?

তা ঠিক বলতে পারব না। তবে ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি পাশেই ছিলুম—সঙ্গে সঙ্গে বিমূঢ় হয়ে পড়ি ঘটনাটার আকস্মিকতায়। একেবারে যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। কিন্তু করোনারের রায় মেনে না নিয়েও গত্যন্তর ছিল না। আমার স্ত্রীর খুব সিরিয়াস ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল এবং তার জন্যে কাহিলও হয়ে পড়েছিল সে। আর আত্মহত্যা ছাড়া অন্য সন্দেহ সেই মুহূর্তে মনে আনা সম্ভবও ছিল না, কারণ সেই বস্তুটা তার ব্যাগের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়।

কোন্ বস্তু?

সায়ানাইড—হাইড্রোজেন সায়ানাইড!

হুঁ। উনি সেটা তাঁর পানীয়ের সঙ্গে খান্ বোধ হয়?

হ্যাঁ। সে-সময়ে সব প্রমাণগুলোই কেমন আত্মহত্যার স্বপক্ষে একটা একটা করে আমাদের সম্মুখে এসে হাজির হয়!

আচ্ছা, উনি কি আত্মহত্যা করবেন বলে কখনও ভয় দেখাতেন?

একেবারেই না। কুন্তলা বাঁচতে ভালোবাসত। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করে বেঁচে থাকাই ছিল তার কামনা, জীবনের মূলমন্ত্র।

গৌতমের মানসপটে জেগে ওঠে কুন্তীবাঈয়ের নৃত্যরতা অপূর্ব ভঙ্গির নৃত্যগুলি, যেগুলি সে একাধিক নাচের আসরে গিয়ে উপভোগ করেছে।

মনে হয় তার, সত্যি-সত্যিই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা ছিল বাঈজীর জীবনের প্রতিটি অঙ্গক্ষেপ প্রতি পদক্ষেপ। এরকম মেয়ে কখনও আত্মহত্যা করতে পারে না—দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে গৌতমের মনে।

আচ্ছা, সে-সময়কার ওঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তারের মতামত কি ছিল? গৌতম প্রশ্ন করল আবার।

কুন্তলাকে বরাবর যে ডাক্তার দেখতেন, অর্থাৎ ডাঃ তাপস মিত্র, তিনি কুন্তলার অসুখের সময়ে কলকাতার বাইরে ছিলেন। বাধ্য হয়ে ওই পাড়ারই এ্যালোপ্যাথ ডাঃ বিজলীবন্ধু গুহকে খবর দিয়ে আনা হয় সে-সময়ে। তিনি পরীক্ষা করে বলেন, এখনও পরিষ্কার মনে আছে তা আমার, জ্বর আক্রমণে কুন্তলার মনটা নাকি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার জন্যে সে ভেতরে ভেতরে একটা নৈরাশ্য বোধ করছে। অবশ্য ভয় পাবার নেই কিছু তাতে, তবে চোখে চোখে রাখা প্রয়োজন তাকে কয়েক দিন।

একটু থেমে সুব্রত আবার বলতে শুরু করল।

ওই চিঠি দুটো পাবার পর আমি ডাঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু তাঁকে চিঠির বিষয়ে কিছু জানালুম না, শুধু আলোচনা করলুম, যা-যা ঘটেছিল সব নিয়ে; তিনি বললেন, তিনিও কম অবাক হন নি খবরের কাগজে ঘটনাটা পড়ে ও পরস্পরমুখে সব শুনে, তবে তিনি বিশ্বাস করেন নি এবং এখনও করেন না যে কুন্তলার মত মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে। কুন্তলার স্বভাব যা তা আত্মহত্যার বিপক্ষেই রায় দেয় সম্পূর্ণ।

আবার মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে সুব্রত বলতে শুরু করল, ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আলোচনার পর, আমার নিজের ধারণাটা মনে মনে আরও দৃঢ়মূল হলো, সত্যিই তো, কুন্তলার মত মেয়ে আত্মহত্যা করে কি করে—আত্মহত্যা সে করতেই পারে না! তার মত মেয়ে, যে রাগ করলে তার দুমদাম কাজের মধ্যে থেকে প্রকাশ করে তা, যে মনের কোণে কোন কথা চেপে রাখতে জানে না, যে মুখের ওপর স্পষ্ট জানিয়ে দেয় তার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ হলে বা অনভিপ্রেত কোন কাজের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে যে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে নি জীবনে, সে আর যাই করুক আত্মহত্যা যে করবে না সেটা ঠিক।

গৌতম একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, আচ্ছা, নৈরাশ্য ছাড়া আত্মহত্যা

করবার আর কি কোন কারণ থাকতে পারে না? ধরুন, যেমন কোন ব্যাপারে অসুখী থাকা বা কারো ব্যবহারে অসুখী বোধ করা?

অসুখী? না, সেরকম তো কিছু হবার কথা নয়। আমার সঙ্গে অন্তত বেশ ভালো সম্পর্কই ছিল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

আপনি ছাড়া আর কারো ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি একাজ করতে পারেন তো?

সেটা ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, শুই সামান্য ব্যাপারে সে একাজ করবে না নিশ্চিত।

কি করে নিশ্চিত হলেন আপনি?

তার স্বভাব জানি বলেই একথা এত জোরের সঙ্গে বলতে পারলুম মিঃ সেন।

তা হলে আত্মহত্যা করেন নি তিনি এটাই আপনার দৃঢ়বিশ্বাস?

হ্যাঁ মিঃ সেন। আরো একটা পয়েন্ট আছে, কুন্তলা যদি আত্মহত্যাই করবে, সে ওই কষ্টকর বিষটা ব্যবহার করবে কেন? অল্প সময়ের জন্যে হলেও, হাইড্রোজেন সায়ানাইড এত যন্ত্রণাদায়ক যে সেটার ব্যবহারের কথা কল্পনাও করা যায় না। কুন্তলা তার চেয়ে কোন ঘুমের ওষুধ একটু বেশি ডোজে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লে তার কষ্টটা আরো কম কষ্টকর হতো, তাই না কি?

হ্যাঁ, সে বিষয়ে একমত আমি আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, ওঁর পক্ষে ওটা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলো কি করে?

ওই বস্তুটা সে নাকি কোন এক ইলেকট্রো-প্লেটিংয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করে। সেখানে কারো সঙ্গে গিয়েছিল কুন্তলা মৃত্যুর মাত্র দিন দুই আগে ও ওটার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে চেয়ে নিয়ে আসে একটুখানি ওই শিশিটা করে কৌতূহলের বশে।

কী সাংঘাতিক! তার পর?

আর কিছু জানি না। আমাকে যেটুকু বলেছিল সে সেইটুকুই শুধু জানাতে পারলুম।

তা হলে উনি যে-বস্তু এনেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই বস্তু সেবনেই নিহত হলেন। এই দুটোর মধ্যে একটা যোগাযোগ লক্ষ্য করছেন সুব্রতবাবু? ভালো কথা, উনি সেই দোকানে কার সঙ্গে গিয়েছিলেন?

তা বলতে পারব না মিঃ সেন। অনাবশ্যক বোধে সেই মুহূর্তে ও-প্রশ্ন আর করি নি আমি তাকে।

হুঁ। রহস্য ওইখানেই। ওটা আনেন উনি এবং তা খেয়েই মারা যান। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, উনি কি আত্মহত্যা করবেন বলেই ওটা নিয়ে আসেন, না যার সঙ্গে গিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি সুবিধা বুঝে একাজ করল?

সুব্রত চুপ করে থাকে গৌতমের চিন্তাকুল মুখের দিকে চেয়ে।

গৌতম বললে, তা হলে আত্মহত্যার কারণটা এসটাবলিশড করা গেল না। কিন্তু কেউ যে হত্যা করবে ওঁকে—তারও তো একটা কারণ থাকবে?

ঠিক স্যার, আমিও মনে মনে সেকথা বারবার আলোচনা করেছি সেদিন থেকে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রশ্নটা যতবার জেগেছে আমার মনে, ততবারই বড় অদ্ভুত বলে ঠেকেছে তা আমার নিজের কাছেই।

কেন?

একজন লোককে এত সহজে যে কেউ হত্যা করতে পারে তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না আমি।

সে-বিশ্বাস এলো কি করে আপনার?

ওই চিঠি দুটো পাবার পর থেকেই। ও-দুটোই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল। আমি বুঝতে পারলুম, কুন্তলার কোন ভীষণতম শত্রু তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার প্রতিশোধ-স্পৃহা গ্রহণ করল এইভাবে।

হুঁ। তা হলে কাকে সন্দেহ করেন আপনি এ ব্যাপারে?

সেটা আমি কি করে বলব বলুন? একমাত্র ফাংশনে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ যে হবেন তা তো মনে হয় না।

কিন্তু ফাংশনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তো প্রত্যেকেই বিশেষ পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ছিলেন আপনাদের?

হ্যাঁ, তা ছিলেন।

তা হলে তাঁদের সন্দেহ করা যায় কি করে! চাকর-বাকরদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ হয় কি?

না, আমাদের বাড়ির লোকজনেরা খুব বিশ্বাসী আর প্রত্যেকেই পুরনো। একমাত্র ডিনারের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল যাদের, তাদের লোক-জনকে সন্দেহ করা যায়, কিন্তু তাদেরও ঠিক সন্দেহ করতে মন চায় না।

কেন ?

শুধু শুধু তারা একাজ করতে যাবে কেন ?

সময়ে সময়ে এরকমও সম্ভব হয় বৈ কি। আচ্ছা, কেটারিং-এর ভার দিয়েছিলেন কাদের ওপর ?

দত্ত এণ্ড বড়াল কোম্পানির ওপর। কিন্তু পুলিসের তরফ থেকে তাদের জেরা ইত্যাদি সব করা হয়েছিল সেসময়ে। কাউকেই সন্দেহ-জনক মনে করে নি তারা।

তা হলে অভ্যাগত অতিথিদের মধ্যেই কেউ হবেন নিশ্চয়ই। আচ্ছা, বলুন তো, তাঁদের মধ্যে কাউকে কি সন্দেহ হয় ?

সেটাও তো অস্পষ্ট ধারণার ওপর নির্ভর করে বলতে হয়। আসল কথা হচ্ছে, কার মনে কি ছিল, সেটা আমরা বাইরে থেকে বলি কি করে ?

আচ্ছা, আমাকে বুঝিয়ে বলুন—সেদিন আপনারা টেবিলে গিয়ে বসলেন, কিভাবে কার পাশে কে বসলেন—ঠিক ঠিক সেইমতন বলে যান্ !

টেবিলটা ছিল গোলাকার। ডাইনিং টেবিল। চার পাশে আমরা বৃত্তাকারে সকলে বসি। প্রথমে আমাকে ধরেই বলি—আমি, আমার বাঁ পাশে অলকা ভোস, তাঁর পাশে মনীশ লাহাড়ী, তার পর কুন্তলা, তার পাশে অজয় ভোস, তার পর মালা, মালার পাশে কুন্তলার চারজন বান্ধবী। ওদিকে আমার ডান পাশে বসে সেবা, তার পাশে কুন্তলার ওস্তাদ আকবর খাঁ ও তার পর নৃত্যশিক্ষক শ্যামসুন্দর।

ও-কে। এবার বলুন তো, আপনারা ড্রিঙ্ক করেছিলেন কি না ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ড্রিঙ্ক সাপ্লাই করে কে ?

আমিই কিনে নিয়ে আসি নিজের হাতে তা মার্কেট থাকে।

টেবিলে বসে প্রথমেই কি ড্রিঙ্ক করেছিলেন আপনারা ?

হ্যাঁ, মানে, প্রত্যেকের গ্লাসেই ঢেলে দেওয়া হয় তা। তবে কেউ মুখে দিয়েছিল, কেউ আবার দেয়ও নি।

মিসেস রায়, মানে, আপনার স্ত্রী, কি টেবিলে বসে প্রথমেই ড্রিঙ্ক করেন ?

হ্যাঁ, সে টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে,

সেজন্তে সকলের আগেই একটু ড্রিঙ্ক করছে বলে কেউ যেন কিছু মনে না করেন।

তার পর?

কুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে অজয় ভোসও গ্লাসটা তুলে নিল ঠোঁটের ডগায়।

একমাত্র অজয় ভোস?

তাই তো মনে হলো।

তার পর কি ঘটল?

আলো ফিউজ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার পর।

সকলে কি করছিলেন আপনারা তখন?

আমরা খেতে আরম্ভ করি নি তখনও, বোধ হয় আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই স্টার্ট করতুম—তার আগেই ওই বিভ্রাট ঘটে গেল।

কি করলেন আপনারা সকলে?

হৈ-হৈ করে উঠে পড়লুম আমরা সকলে। একটা বিশ্রী বিশৃঙ্খলার ও হট্টগোলের সৃষ্টি হলো। কিন্তু বেশিক্ষণ সে অবস্থা থাকল না। ইলেকট্রিসিয়ান উপস্থিত ছিল, সে মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই ফিউজ সেরে দিল।

আপনারা কি সকলে টেবিলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন?

খুব দূরে নয়—একটু তফাতেই জটলা করছিলুম।

তার পর আলো জ্বললে আবার যে-যার স্বস্থানে ফিরে এলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু ঠিক ঠিক নিজের জায়গা চিনে বসতে পেরেছিলেন সকলে?

নিশ্চয়ই। কেন, একথা জিজ্ঞাসা করবার হেতু?

এমনি। তার পর কি হলো?

আমরা বসলুম। কুন্তলার ও অজয় ভোসের গ্লাসে আবার ড্রিঙ্ক ঢেলে দিয়ে গেল বয়। খাওয়া শুরু হলো। কুন্তলা দু-এক টুকরো খাবার মুখে দিয়েই আবার ড্রিঙ্কের গ্লাসটা তুলে নিল। ওর দু-এক বোতলে তেষ্টা মিটত না। কিন্তু এবারেই ঘটল অঘটন। এক চুমুক খেয়েছে কি না-খেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখি সে কিরকম করছে। সকলে আমরা ছুটে গেলুম। তার পর ডাক্তার আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হলো না, তার আগেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মেঝের ওপর ঢলে পড়ল সে।

হুঁ। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় ভোসকে। তিনি ছিলেন মৃতার বাঁদিকে আর তার ফলে তাঁর ডান হাতের কাছাকাছিই ছিল মিসেস রায়ের গ্লাস। আলো যে-সময়ে নিভে যায়, সেই হট্টগোলের মাঝখানে গ্লাসের মধ্যে পটাসিয়ামের শিশি উজাড় করে দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু ডানদিকে যিনি বসেছিলেন, তাঁর পক্ষে একাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ তাঁকে তা হলে ঝুঁকে পড়ে একাজ করতে হতো। সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া চলে।…অজয় ভোসের কথা ধরা যাক্ এবার তা হলে। আচ্ছা, তাঁর কি স্বার্থ থাকতে পারে আপনার স্ত্রীকে সরিয়ে দেবার মূলে?

মুহূর্তে জ্বলে উঠল সুব্রতর চোখ-জোড়া। একটু ব্যগ্রস্বরেই বলে উঠল সে, কুন্তলার সঙ্গে একটু বেশি মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিল অজয়, আর তার ফলে কোন ব্যাপারে হয়তো ওদের দুজনের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে থাকতে পারে; বোধ হয় সেজন্যেই শেষ পর্যন্ত পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিল এভাবে।

খুব অসম্ভব নয়। এ ছাড়া আর কিছু—মানে, ডেফিনিট কোন চার্জ……

সরি, আর কিছু জানা নেই আমার।

আশ্চর্য, আপনার স্ত্রী—অথচ আপনি জানেন না কিছু তাঁর সম্বন্ধে… অবশ্য এসব ক্ষেত্রে এই রকমই হয়, যাক্ গে, এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাই। মিসেস রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে দু নম্বর সম্ভাবনা কিছু আছে কিনা ভেবে দেখা যাক্। কোন মহিলাকে কি আপনার সন্দেহ হয়?

মহিলা? না, সেরকম তো কারো কথা মনে আসছে না! কিন্তু মেয়েদের দ্বারা কি একাজ করা সম্ভব?

কেন নয়? মেয়েরা মেয়েদেরই ওপর বেশি হিংসে পোষণ করে জানবেন। আর এই ফাংশনে মেয়ের সংখ্যা ছিল পুরুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং তাদের কার মনে কি ছিল আপনি জানবেন কি করে?

কিন্তু আমার তো কাউকে সন্দেহ হয় না।

একেবারে 'না' বলবেন না, ভেবেচিন্তে বলুন।

ভাববার নেই কিছু মিঃ সেন। মেয়েদের মধ্যে কেউ যে একাজ করতে পারে তা বিশ্বাস করি না আমি।

আচ্ছা, এই ফাংশনের দায়িত্ব ছিল কার ওপর ?

সেবা আর মালার ওপর।

দুজন কেন ?

দুজনের ওপর দু দিকের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। সেবার ওপর ভার ছিল—খাওয়া-দাওয়া দিকটায় নজর রাখবে সে, আর মালাকে চার্জ দেওয়া হয়েছিল—নাচ-গানের আসরের সব ভারটুকু।

সেবা দেবী কি একবারও নাচ-গানের আসরে এসে যোগদান করেন নি ?

হ্যাঁ, সে তো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সেখানেই ছিল। মাঝে মাঝে চাকর ভরত বা খানসামাদের কেউ ডেকে নিয়ে গেলে যাচ্ছিল—আবার তখনই চলে আসছিল।

আচ্ছা, এবার বলুন, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর বোনের কি কিছু সুবিধা হতো—মানে, টাকা-পয়সার দিক থেকে আর কি !

না-না, কি বলছেন মিঃ সেন, মালা এখনও স্কুলের গণ্ডী পার হয় নি…

আপনি মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে তা হলে এখনও অজ্ঞ বলব। স্কুলের গণ্ডী পার হয় নি বলেই যে সে একাজ করতে পারে না তার কোন মানে নেই !

কিন্তু মালা—সে কুন্তলা-অন্ত প্রাণ, তাকে. ভালোবাসত…

মানলুম তা, তবুও সুযোগ-সুবিধে পেলে…আমি জানতে চাই, তার সেরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা ? আপনার স্ত্রী তো প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন আর রোজগারও করতেন অনেক, তাঁর মৃত্যুর পর এইসব সম্পত্তি ও টাকাপয়সা পাবার কথা ছিল কার ? আপনার ?

না, মালার।

মালার ?

হ্যাঁ, সেই রকম উইলই করে কুন্তলা।

কুন্তলা দেবী করেন—তার মানে ?

মানে কুন্তলাই সব সম্পত্তির মালিক ছিল তো—তার বাবা মালাকে এক কপর্দকও দিয়ে যান নি, কিন্তু কুন্তলা কেন জানি, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে সেই সম্পত্তি উইল করে তো মালাকেই দিয়ে যায় সব।

স্ট্রেঞ্জ! দু বোনের একজন বিরাট ধনী—আর-একজন পথের

কাঙাল? তা হলে মিস সেনের এ বিষয়ে মনে মনে গোপন আক্রোশ একটা থাকা খুবই স্বাভাবিক!

আমি জানি মালার মনে সেসব কিছু ছিল না।

হয়তো ছিল না—কিন্তু হিংসের ভাব ছিল একটা নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আর কার সেই উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কারো নয়—আর কারো নয়। কুন্তলার কোন শত্রুই ছিল না পৃথিবীতে। একটু যেন রাগতভাবেই বলে ওঠে সুব্রত, আমিও কম চেষ্টা করি নি খুঁজে বার করবার—সম্ভাবিত সব জায়গায় গিয়েছি, জিজ্ঞাসাবাদ করেছি যাকে সন্দেহ হয়েছে, জলের মত অর্থব্যয় করেছি, কিন্তু খুঁজে পাই নি কাউকে। ভোসেদের বাড়ির কাছে নিউ আলিপুরে একটা বাড়িই কিনে ফেললুম শেষ পর্যন্ত এজন্যে।

সুব্রতর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গৌতম, অকস্মাৎ বলে উঠল, আপনি কিন্তু অনেক কথা গোপন করে যাচ্ছেন এখনও সুব্রতবাবু!

বিব্রত বোধ করল নিজেকে সুব্রত, আড়ষ্টভাবে বলে উঠল, না-না, সবই তো বলেছি···

বলেছেন, কিন্তু মন খুলে বলতে পারেন নি সব। আপনার স্ত্রীর ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে আপনি অনেক সত্য গোপন করে রেখেছেন। তিনি নিহত হন, না আত্মহত্যা করেন—সেটাই আপনার কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি মারাত্মক, সে-ব্যাপারের কোন সুরাহার দিকে নজর দিলেন না!

আওয়াজ নেই কোন সুব্রতর দিক থেকে। এক ধরনের অপ্রস্তুত-হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের ওপর। মিনিট দুই পরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে সে, বলুন কি জানতে চান?

আপনার স্ত্রী ভালোবাসতেন অন্য কাউকে, তাই না?

হ্যাঁ।

অজয় ভোসকে?

তা ঠিক বলতে পারব না। সে ব্যক্তি অজয় ভোসও হতে পারে, আবার মনীশ লাহাড়ীও হতে পারে। ঠিক যে কোন্ জন তার ভালো-বাসার পাত্র ছিল তা এখনও জানতে পারি নি। অত্যন্ত জঘন্য নোংরা ব্যাপার মশাই!

আচ্ছা, এই মনীশ লাহাড়ী সম্বন্ধে যা জানেন বলুন তো আমায়। আমার যেন মনে হচ্ছে, নামটা এর আগে শুনেছি এবং লোকটাকে দেখেছিও কোথাও।

কিচ্ছু জানি না লোকটা সম্বন্ধে। গভীর জলের মাছের মতন—ধরেও ধরতে পারা যায় না তার নাগাল।

চেষ্টা করেও জানতে পারেন নি কিছু?

না, বিশ্বাস করুন, একেবারে না। সে বিষয়ে সত্যিই আমি ব্যর্থ হয়েছি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানাতে পারি আপনাকে। এক দিন কুন্তলা কাকে যেন চিঠি লিখছিল, লাভ-লেটার—তাও আমি জানতে পারি ব্লটিং-পেপারটা পরীক্ষা করে, কিন্তু কোন নাম ছিল না সে-পত্রে, তা হলে ব্লটিং-পেপারের ওপর সেটা ঠিকই দেখতে পেতুম।...

এই তো, এগোবার মত আবার খানিকটা ক্লু পাওয়া গেল—অলকা ভোস এসে পড়লেন আমাদের আলোচনাব মধ্যে, অবশ্য যদি তাঁর স্বামীর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা বেশ ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে পৌছে থাকে।...কোন মেয়েই চাইবে না যে তার স্বামী বে-হাত হয়ে যাক্, অন্য মেয়েছেলেকে নিয়ে ঘর করুক সে। যদি সেরকম গণ্ডগোলের কিছু বোঝে, নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করবে তার পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে। তার জন্যে প্রয়োজন হলে নৃশংস হয়ে উঠতে অবধি দ্বিধা করবে না সে। যাক, অনেকগুলো প্রমাণ হাতের সামনে এসে গেল, রহস্যময় মনীশ লাহাড়ী এবং অজয় ভোস ও তার স্ত্রী, আর মালা সেন। আচ্ছা, এবার সেই আর-একজন মহিলা—সেবা কর যাঁর নাম, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্, আসুন।

সেবার এ ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই মিঃ সেন—সে তো সম্পূর্ণ অন্য বাড়ির লোক। আমাদের বাড়িতেই তার শৈশবাবাস্থা কেটেছে। ...কুন্তলার কাছে আসত মাঝে মাঝে শুধু তারই অনুরোধে আর বন্ধুত্বের খাতিরে—তাও আমার বিয়ের পরে। না-না, অন্তত তার কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না—এ সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দিতেও প্রস্তুত আমি।

আপনাদের বাড়িতে মানুষ—মানেটা ঠিক বুঝলুম না!

মানে, তার যখন বছর তিন-চার বয়স, তখন তার বাবা ও মা মারা যান তাকে আমাদের জিম্মায় রেখে। সেই থেকে সে আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে আমাদের সঙ্গে। বাবা খুব স্নেহ করতেন

সেবাকে।

উনি কি করেন এখন? বিয়ে হয়েছে?

নার্সিং শিখছে। বিয়ে সে করবে না বলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যেই ওই পেশা বেছে নিয়েছে।

মেয়ে কেমন তিনি? স্বভাব-চরিত্র ভালো?

অনিন্দ্যসুন্দর। উচ্ছ্বাসভরে বলে ওঠে সুব্রত, তার সংস্পর্শে এলে তবে বুঝতে পারতেন। একবার যে তার সঙ্গে মিশেছে, সে আর ছাড়তে পারবে না তাকে। তেমনই অদ্ভুত পরোপকারী। অযাচিতভাবে প্রাণ-ঢালা সেবা দিয়ে বশ করতে তার জুড়ি নেই—এক কথায় এটুকু বললেও অত্যুক্তি করা হবে না তার সম্বন্ধে।

ওঃ, আপনি দেখছি সেবা দেবীর একজন গোঁড়া ভক্ত। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললে গৌতম।

আপনিও না হয়ে পারবেন না, যদি একবার তার সঙ্গে আলাপ করেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো সেবাকে ছাড়া চলতেই পারি না এক পাও। প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তার ওপর বলতেও পারেন। তাছাড়া মেয়েটা যেমন বিশ্বস্ত, তেমনই সত্যবাদী।

আপন মনে স্বগতোক্তি করে গৌতম, তোমার মাথা। তোমাকে পুরো-পুরি আয়ত্তের মধ্যে এনে বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছে, আর ঠিক সেইভাবে তুমি নেচে চলেছ। মনে মনে ছকে ফেলে গৌতম তখনই অনুপস্থিত সেবা কর সম্বন্ধে তার ধারণাটুকু। এই অতি বিশ্বাসী আর সত্যবাদী মেয়েটিই যে কুন্তীবাঈকে সরিয়ে দেয় নি তার গোপন উদ্দেশ্য সাধন করতে, তারই বা ঠিক কি? শুধু তাই নয়, সে অন্যের এজেন্ট হয়েও একাজ করতে পারে। অথবা সুব্রতকে ভালোবাসে, সেজন্যে কুন্তীবাঈকে সরিয়ে দিলে সে-সুযোগ তার এসে যাবে—সে-কথা ভেবেও একাজ করা তার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

সুব্রত তাকিয়েছিল গৌতমের চিন্তামগ্ন মুখের দিকে। কতক্ষণ পরে অস্বস্তি বোধ করায় নড়েচড়ে উঠল সে একবার। গৌতমের ধ্যানমগ্ন ভাবটা কেটে যায়, মৃদু স্বরে বলে উঠল সে, আমার কিন্তু আপনাকেও একটু-একটু সন্দেহ হচ্ছে।

একটু যেন চমকে উঠল সুব্রত, আমাকে?

হ্যাঁ। সেকশপীয়ারের বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা ওথেলো ও ডেসডিমনার কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করুন তো একবার!

কি বলছেন, শেষ পর্যন্ত আপনি আমার আর কুন্তলার মধ্যে সেই সম্পর্ক খুঁজে বার করলেন! আমি চিরকাল তাকে শ্রদ্ধা করেছি, ভালোবেসেছি অন্তরের সঙ্গে। কুন্তলাও আমাকে ভালোবাসত, পছন্দ করত। আমি যেমন রোমান্টিক নই, তার প্রত্যাশানুযায়ী যেমন নিজেকে তার উপযুক্ত করে তুলতে পারি নি, তেমনি তার কোন কাজে বাধা দিই নি, তার স্ফূর্তির ব্যাপারে, তার অন্য পুরুষের সঙ্গে মেশামেশিতে কোন আপত্তি করি নি একদিনের জন্যেও। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এর মধ্যে খারাপ দেখি নি কিছুই। এসব আমি প্রত্যাশা করেই তার সঙ্গে বিয়েতে মত দিই। তবে মাঝে মাঝে যে বেসামাল হয়ে পড়ি নি তা নয়, তবে সে-ভাবকে কোনদিন বাইরে প্রকাশ করি নি—নিজের অন্তরের মধ্যেই চেপে রেখে নিজের মনেমনে গুমরে মরেছি।

এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে লাগল সুব্রত, আর তাই যদি হয়, আমিই যদি তাকে হত্যা করে থাকি, তা হলে সেই ঘটনাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে আমার কি লাভ? যখন সব ঘটনা চিরকালের জন্যে শান্ত হয়ে গিয়েছে, আত্মহত্যার কেস বলে যখন পুলিস ও আদালত রায় দিয়ে দিয়েছে একবার, তখন সেই ব্যাপারটাকে আবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার সার্থকতা কি, সেটা পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়!

ঠিক। আর সেজন্যেই আপনাকে আমি গোড়া থেকে সেরকম সন্দেহের চোখে দেখি নি। আপনি যদি পাকা খুনী হতেন, তখনই ওই চিঠি দুটো নিয়ে আমার কাছে আসতেন না, নিশ্চয়ই সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতেন আর হাত দুটো ঝেড়ে এক প্রকার বুদ্ধিমানের হাসি হাসতেন। আপনাকে ছুটিয়ে এনেছে আমার নিকট আপনার কৌতূহলী মন মিঃ রায়, আর কেউ নয়…কে লিখল চিঠি দুটো, তাই না?

এঁ্যা! চমকে উঠল সুব্রত, ওঃ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

ব্যাপারটা আপনাকে যতটা না কৌতূহলী করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে আমাকে, সুব্রতবাবু। আপনার বোধ হয় মনে আছে, প্রথম আপনাকে আমি এই প্রশ্নটাই করি, কে লিখল, কে লিখতে পারে চিঠি দুটো! আচ্ছা ধরা যাক, চিঠি দুটো হত্যাকারী লেখে নি; সে কেন তার

নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে, যখন সব গণ্ডগোল চুকেবুকে গিয়েছে এবং সকলেই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিয়েছে! তা হলে লিখল কে? এমন কে আছে, যার স্বার্থ রয়েছে ব্যাপারটাকে আবার খুঁচিয়ে তোলার মধ্যে?

কোন পরিচিত লোক, মনে হয়, একাজ করেছে।

আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা তাই যদি হয়, কে সে এবং কতটুকুই বা জানে সে? কুন্তলা দেবীর কি এমন কোন আপনজন ছিল, যার কাছে তিনি তাঁর গোপন কথাবার্তা বলতেন?

না, সেরকম কেউ ছিল বলে তো জানি না। কুন্তলার মত মেয়ে কারো কাছে মনের কথা বলবে—কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তা।

যাক্ গে, শুনুন সুব্রতবাবু, কুন্তলা দেবী মারা গেছেন, আর তাঁকে বাঁচানো যাবে না। যদি ধরাই যায় যে তিনি আত্মহত্যা করে মরেন নি, নিহত হয়েছেন, তবুও লাভবান হবেন না বোধ হয় কেউ, যদি হত্যা-কারীকে খুঁজে বার করাও যায়। কিন্তু তার ফলে আপনার স্ত্রীর অনেক কিছু গোপন ব্যাপার বেরিয়ে পড়তে পারে এবং তা জনসাধারণের চোখে খাটোই করে দেবে তাঁকে ও আপনাদের সকলকে। এখন ভেবে বলুন, আপনি কি চান তা ঘটুক—আপনার স্ত্রীর প্রাইভেট লাইফের ঘটনাগুলি সব সাধারণ্যে প্রকাশ পাক্?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল সুব্রত, তা হলে কি আপনি চান যে একজন খুনে বিনা চ্যালেঞ্জে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে সমাজের বুকের ওপর? না, আমি তা পারব না। সেই নারকীয় কীটকে যে করে হোক ধরে তার প্রাপ্য শাস্তি তাকে দেওয়াতেই হবে। তার জন্যে সব রকম কষ্ট, সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত আমি।

আপনার যা অভিরুচি সেইভাবেই কাজ করব আমি। তবে যা চাইবেন সেটা ভালো করে ভেবেচিন্তে চাইবেন—পরে না আফসোস করতে হয়।

আমি চাই, সত্যি যা তা প্রকাশ পাক্, যে আসল অপরাধী সে শাস্তি পাক তার কৃতকর্মের জন্যে—এই আমার অন্তরের ইচ্ছে মিঃ সেন।

উত্তম কথা, তা হলে তাই হোক। কিন্তু কেঁচো বার করতে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকবেন সুব্রতবাবু।

সুব্রত মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে, মিঃ সেন, আমার একটা প্ল্যান আছে, সেটা যাতে সফল হয় তার ব্যবস্থা করছি আমি, তবে দরকার হলে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

আপনার আবার কি প্ল্যান? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় গৌতম সুব্রতর দিকে।

আমি শিশমহলে একটা পার্টি দিচ্ছি ঠিক কুন্তলার জন্মদিনের পার্টির মত। সে-পার্টিতে লোক থাকবে সেদিনকার পার্টিতে ঠিক যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন। সেদিন যেভাবে যেরকম ফাংশন হয়েছিল, ঠিক সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সব অনুষ্ঠিত হবে। আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে সেই ফাংশনে দয়া করে।

কি ব্যাপার বলুন তো, কি করতে চান আপনি? গৌতমের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে ওঠে।

একটু মুচকে হাসল সুব্রত, সেটা গোপন ব্যাপার মিঃ সেন। এখনই তা আমি প্রকাশ করতে চাই না—এমন কি আপনার কাছেও না। আপনি সাদা মনে নিমন্ত্রিতের মত ফাংশনে আসবেন, তার পর কি ঘটে দেখবেন!

গৌতম ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, কঠিন কণ্ঠে বললে, এসব করবেন না মিঃ রায়। যার যা কাজ তাকেই তা সাজে—অন্যের এ ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয়। অনেক সময় অনেক জিনিস বইয়ে পড়তে ভালো লাগে বলে তাই যদি নিজেও করতে যান, তাতে বিপদ ঘনীভূতই হয়ে ওঠে। দোহাই আপনার, নিজে এসবের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা এত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তাই আমাদের সময়ে সময়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে যেতে হয়—আপনার মত এমেচারের তো কথাই নেই!

সেইজন্যেই আপনাকে ওখানে উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ করছি মিঃ সেন, আপনি তো আর এমেচার নন্!

মানলুম সেকথা, তবুও আবার বলছি, ওসব আইডিয়া ছাড়ুন। আর আপনি আমাকেও অন্ধকারে রাখতে চাইছেন—এটাও ঠিক হচ্ছে না।

সেটা প্রয়োজন মিঃ সেন।

আমি দুঃখিত সুব্রতবাবু, আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলুম না আমি। আপনার এই গোপন প্ল্যানের নিস্তব্ধ দর্শক হিসেবে আমি

সেখানে উপস্থিত থাকতে কিছুতেই পারব না।

তা হলে আপনাকে ছাড়াই আমাকে আমার প্ল্যান কার্যকরী করবার চেষ্টা করতে হবে। গম্ভীর কণ্ঠে বললে সুব্রত।

দয়া করে একাজ করবেন না সুব্রতবাবু—আবার আপনাকে অনুরোধ করছি।

প্ল্যান অনুযায়ী আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এখন, আর পেছুনো সম্ভব নয়, মিঃ সেন।

জেদের ব্যাপার নয় এটা মিঃ রায়, এর জন্যে শোচনীয় কিছু ঘটে যেতে পারে—আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমি এরকম অনেক দেখেছি ও শুনেছি, সব কখনও সাকসেসফুল হয় না। প্লিজ, লিভ ইট!

দেখবেন আপনি, আমার প্ল্যান কিভাবে আততায়ীকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে—শুধু দেখে যান আপনি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌতম। হতাশ স্বরে বললে, আপনি জানেন না আপনি কি করছেন। এর পরে যেন বলবেন না আবার যে যথাসময়ে সতর্ক করে দিই নি আপনাকে। শেষবারের মত আবারও অনুরোধ করছি, দয়া করে এই পাগলামি ছাড়ুন।

ছোট ছেলের মত এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘাড়টা প্রবলভাবে নেড়ে সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

॥ দশ ॥

বৈশাখের প্রথম দিন। নববর্ষের শুভ বার্তা নিয়ে এলো কিনা বোঝা গেল না, তবে চারিদিকে যে ঘনায়মান দুর্যোগ নিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠল, তা একটু একটু বিচলিত করল বৈকি অনেককে!

সংক্রান্তির দিন থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে ছিল। সেই মেঘান্ধকার আকাশ নিয়েই নববর্ষের প্রভাত দেখা দিল। চাপ চাপ জমাট অন্ধকারের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ও বিশ্রী থমথমে আবহাওয়া।

অশুভ অমঙ্গল আশঙ্কায় মালা চঞ্চল হয়ে ওঠে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল

প্রভাতের বদলে এ কী অদ্ভুত খামখেয়ালীপনা প্রকৃতির! বছরের প্রথম দিনে এ কী নিদারুণ পরিহাস বিধাতাপুরুষের!

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে মালা তার প্রাত্যহিক ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সুব্রত পর্যন্ত বিমনা হয়ে পড়ে কাগজখানার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে এবং সেটা এক পাশে ঠেলে রেখে জানালার ভেতরে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় ছেয়ে যায় তার মন।

পিসীমা প্রভাসুন্দরী বসেছিলেন মালা ও সুব্রতর অদূরে। টেবিল থেকে দূরে একখানি চেয়ারের ওপর বসে ফোঁপাচ্ছিলেন তিনি।

আরো একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করেন প্রভা-সুন্দরী, আমি জানি ছেলেটা সাংঘাতিক একটা কিছু না করে ছাড়বে না। এত বেশি আত্মাভিমানী—কখনই সে এভাবে লিখত না, যদি না সত্যিকারের জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিত তার সামনে।

কাগজটা টেনে নিয়ে ভাঁজ করতে করতে সুব্রত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, আচ্ছা, কেন আপনি মিছিমিছি ভাবছেন বলুন তো! আমি তো বলেছি, যা করার দরকার করব আমি।

আমি জানি, বাবা সুব্রত, তোমার অন্তকরণ সত্যিই দয়ালু। কিন্তু মায়ের মন আমার, কি রকম যেন ভয়-ভয় করছে, একটু দেরি হয়ে গেলে বাছার আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি যেকথা বলেছ, খোঁজখবর নিয়ে টাকা পাঠানো—তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বাবা।

না-না, যাতে শিগগিরই একটা ব্যবস্থা হয় তার চেষ্টা করব আমি।

সে জানিয়েছে, দু তারিখের মধ্যেই টাকাটা পাঠাবার জন্যে, আর কালই দোস্রা—আমি কখনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না, যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললে সুব্রত, কিচ্ছু ঘটবে না।

কিন্তু বাবা, যদি ঘটে, তখন তুমিও অপ্রস্তুতে পড়বে···

আঃ, আপনি বড্ড বেশি চিন্তা করছেন। বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে সুব্রত, বলেছি তো, সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্যিই পিসীমা, আপনি কেন এত ঘাবড়াচ্ছেন! মালা কোমল কণ্ঠে

বলে ওঠে, জামাইবাবু যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করবেনই। আর তা ছাড়া এ ধরনের ব্যাপার তো আর নতুন নয়!

হ্যাঁ, বোধ হয় মাস তিনেকও কাটে নি এখনো, রতন টাকা নিল—কতকগুলো জোচ্চোর বন্ধু মিলে তাকে অদ্ভুতভাবে ফাঁসিয়েছে বলে! সুব্রত ন্যাপকিনে ঠোঁটটা মুছে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে। তার পর প্রভাসুন্দরীর কাছে গিয়ে অনুনয়ের সুরে আবারো বললে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না পিসীমা, আমি এখনই গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

সুব্রতকে আচমকা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে মালাও ছুটে গিয়ে তার পিছু নেয়। তার পর সঙ্গে যেতে যেতে গলা খাটো করে অনুরোধ করে, জামাইবাবু, আজকের রাত্তিরের ফাংশনটা বন্ধ রাখলে ভালো হয় না? পিসীমা বড্ড মনমরা হয়ে পড়েছেন, তারপরে এই দুর্যোগ—ওটা বন্ধ রাখলেই বোধ হয় ভালো হতো।

হঠাৎ যেন ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে ওঠে সুব্রত, কেন, কিসের জন্য? ফাংশন বন্ধ করতে যাব কেন? একটা জোচ্চোর বাটপারের ভয়ে আমাদের পেছিয়ে পড়তে হবে? এক নম্বরের ব্লাকমেলার ছোঁড়াটা—আমি যদি হতুম, এক পয়সাও দিতুম না!

পিসীমা কিন্তু তার সম্বন্ধে অন্য রকম ভাবেন ও বলেন। ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করলে মালা।

পিসীমা বুদ্ধিহীন, তার ওপর মেয়েছেলে। তারপর বুড়ো বয়সের সন্তান—সুতরাং তিনি বকবেন বৈকি।...আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে বাঁদর করে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। শেষ জীবনে তাঁর বেশ কষ্ট আছে বলে রাখলুম তোমাকে।...যাক্ গে, আমার কর্তব্য যতটুকু, সেটুকু করব আমি—সন্ধ্যের মধ্যেই যাতে উনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, তার ব্যবস্থা করছি আমি।

তাই করুন না হয়, পিসীমা সত্যিসত্যিই ছেলেটার জন্যে ভেবে ভেবে শুকিয়ে যেতে বসেছেন।

সে তো পরিষ্কার দেখতেই পাচ্ছি। যে কাজের যে পরিণাম—তার বাইরে কিছু হওয়া অসম্ভব। আমাদের চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব, সেইমত করবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা শোন, আমি এখন চললুম, আজকের ফাংশনটা নিয়ে যদিও ব্যস্ত থাকব, তবু পিসীমার কাজটুকু করবার আপ্রাণ

চেষ্টা করব—তাঁকে জানিয়ে দিও সেকথা।

চলে যায় সুব্রত সামনের দিকে হনহনিয়ে।

মালা ফিরল। ডাইনিং-হলের দিকেই যাচ্ছিল সে, অকস্মাৎ টেলিফোন বেজে উঠতে ধড়মড়িয়ে ছুটল সেদিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রিসিভারটা তুলে নিল কানের কাছে, হ্যালো—কে?

মুখের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় মালার। সাদাটে ভাবটা কেটে গিয়ে সে-জায়গায় আরক্তিম হয়ে ওঠে সমস্ত মুখখানা। এদিক ওদিক তাকিয়ে নীচুগলায় জিজ্ঞাসা করলে, কে মনীশ!

হ্যাঁ, অধমই কথা কইছে। কাল কোথায় ছিলে? দু-দুবার চেষ্টা করেও ফোনে পেলুম না! সুব্রতবাবুর সঙ্গে কোন মহৎ কাজে ব্যস্ত ছিলে নাকি?

তার মানে?

মানে আজকের ফাংশনটা! হ্যাঁ, ভালো কথা, সুব্রতবাবু হঠাৎ অত পীড়াপীড়ি করছেন কেন ফাংশনটায় উপস্থিত থাকবার জন্যে? এটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ হয়ে গেল না কি! আমি ভাবলুম, তোমার তরফ থেকেই বুঝি কিছু কোন প্রচেষ্টার ফলে……

না-না, বিশ্বাস করো, আমি এ ব্যাপারে আদৌ নেই।

তা হলে, তোমার জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণ…এটা কি তাঁর মনের পরিবর্তনেই ঘটল?

ঠিক তা নয়! এটা……

হ্যালো—চলে গেলে নাকি তুমি?

না-না, এই তো, বলো!

কি যেন বলতে বলতে থেমে গেলে? কথাটা কি—বলেই ফেলো না। …মলি, টেলিফোনের ভেতর দিয়ে তোমার দীর্ঘশ্বাস পরিষ্কার আমার কানে এসে পৌঁছেছে—কি, কি ব্যাপার, পরিষ্কার করে খুলে বলো!

না-না, কিছু না। কাল ঠিক হয়ে যাব আমি। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কাল বলব বলে যেকথা আজ বলতে চাইছ না, সেকথা বলবার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। লক্ষ্মীটি, বলো আমাকে, আজই।

না—না।

মলি! প্লিজ! আমাকে সব খুলে বলো।

না—না। আমি বলতে পারব না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি।

আমাকে বলো রাণী, শুধু আমাকে!

না—আমি বলতে পারি না। তুমি অন্য কোন কথা বলো মনীশ।

কি কথা বলব আর?

তুমি কি—দিদিকে তুমি কি সত্যিই ভালোবাসতে?

স্তব্ধতা এক মুহূর্তের, তার পরেই একটা উচ্ছ্বসিত হাসি।

ওঃ, তা হলে এই ব্যাপার! হ্যাঁ মলি, কুন্তীকে একটু ভালোবেসে ছিলুম। তুমি তো জানো, কি রকম আকর্ষণ ছিল তার। তারপর এক দিন, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, হঠাৎ তোমাকে দেখতে পাই এক লহমার জন্যে—সিঁড়ি দিয়ে নামছিলে তুমি, মুহূর্তের মধ্যে কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারলুম না—সেইক্ষণ থেকে অন্য সব নারীমূর্তি ধুয়ে মুছে গেল আমার মন থেকে, শুধু তুমি, তুমিই শুধু জুড়ে বসলে আমার হৃদয়-রাজ্য। এর একবর্ণও মিথ্যা নয়, অতিরঞ্জিত নয়। যে-কোন দেবতার নামে শপথ করে বলতে পারি আমি তা।

শপথ না করলেও বিশ্বাস করি আমি তোমার কথা। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমার স্পষ্টবাদিতায়।

তা হলে আজ রাত্তিরে দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে—তোমার জন্মদিনের পার্টিতে, ঠিক তো?

হুঁ।

তোমার যেন সেরকম একটা আগ্রহ নেই বলে মনে হচ্ছে—কি ব্যাপার?

সত্যিই আমার কেমন ভালো লাগছে না।

স্বাভাবিক। আমারও ব্যাপারটাকে কেমন গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বারণ করেছিলুম ওই শিশমহলে ফাংশনটা করতে। শুনলেন না জামাইবাবু, ওঁরও জিদ—উনি ওখানেই পার্টিটা দেবেন, ঠিক দিদির জন্মদিনের পার্টির মতন।

আর ভেবে কিছু লাভ নেই মলি, যা হবার হবে—আমি ঠিক সন্ধ্যায়

পরেই গিয়ে পৌছচ্ছি, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। সো লং!

শিথিল হাতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল মালা। তার পর কানের ওপর ঠাণ্ডা হাতটা একবার বুলিয়ে শ্লথ চরণটাকে টেনে টেনে চলল প্রভাসুন্দরীর ব্লকের দিকে।

সুব্রত আশা করতে পারে নি যে সে সেবাকে এভাবে পেয়ে যাবে। এতখানি বেলা পর্যন্ত সেবা সাধারণত বাড়িতে থাকে না।

বিস্মিত সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে সেবা হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, কি খবর, হঠাৎ এ সময়ে?

না, মানে, আজ যাচ্ছ তো—একটু সকাল সকাল যেও কিন্তু।

উঁহু, ওটা ঠিক তোমার মনের কথা হলো না—কেন এসেছ, ঠিক করে বলো তো?

সুব্রত যেন হঠাৎ ভেঙে পড়ে, সেবু, এবারও তোমার স্মরণাপন্ন না হয়ে পারলুম না!

আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে সেবা, কি হলো, কি ব্যাপার?

হাতের টেলিগ্রামখানা এগিয়ে দিল সুব্রত সেবার দিকে।

আবার রতন গুপ্ত! উঃ, লোকটা দেখছি পাগল করে দেবে!

মুখে ও-কথা বললেও ভেতরে ভেতরে সেবার যেন অন্য ভাব খেলে যায়। সুব্রত যদি ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকত, তা হলে সেবার মুখের পরিবর্তন-টুকু আন্দাজ করতে পারত ঠিক।

সেবু, পড়লে?

হ্যাঁ।

বছরখানেক আগে রতনকে রেঙ্গুনে পাঠানো হয়—তার পর এবার নিয়ে তিনবার বিরক্ত করল সে, তাই না?

হ্যাঁ, যত দূর মনে পড়ে আমার, তারিখটা ২৫শে ফাল্গুন ছিল।

কী আশ্চর্য, তুমি এখনও সে তারিখটা মনে করে রেখেছ!

এক টুকরো ম্লান হাসি খেলে যায় সেবার ঠোঁটের ওপর। মনে মনে ভাবে সে, কেন যে মনে করে রেখেছি, তুমি তার কী বুঝবে সুব্রত? আমাকে যে জাগিয়ে তুলল ঘুম থেকে, তার কথা কি এত সহজে ভুলতে

পারি আমি ?

কী ভাবছ ? সুব্রত আচমকা প্রশ্ন করে সেবাকে।

নাঃ—এই—কি করবে বলে ঠিক করলে, টাকা কি এবারেও পাঠাবে ?

না পাঠিয়ে পার পাব না—ওর মা-বুড়ী যদ্দিন বেঁচে থাকবে ততদিন পাঠাতেই হবে ! কিন্তু এবারে আমি একটু এনকোয়ারি করে তবে টাকা পাঠাব—তোমার কি মত ?

বেশ তো—তার জন্যে কি···হ্যাঁ, সেই ভালো। আমার এক বান্ধবীর দাদা ওখানে আছে--তার কাছে চিঠি লিখে জেনে নিলেই চলবে।

না-না, অত দেরি করা সম্ভব নয়। স্কাউণ্ড্রেলটা কালকের মধ্যেই টাকা পাঠাবার জন্যে আবার লিখেছে—তার মাও ওদিকে অন্নজল ত্যাগ করে বসেছে ! সুতরাং আজকেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

আজকেই ? মুখটা ব্যাজার করে উঠে দাঁড়ায় সেবা, দেখি, কি ব্যবস্থা করা যায়—তবে কোন কথা দিতে পারছি না এখনই।

ও তুমি চেষ্টা করলেই সাকসেসফুল হবে—তা হলে এখনই যাচ্ছ তো তোমার বান্ধবীর কাছে ?

অগত্যা।

তোমার কাছে আবার কখন্ আসব সেবু ?

আমার কাছে আসার কি দরকার, সন্ধ্যের সময় দেখা তো হচ্ছেই ?

ওরে বাবা, তা হবে না—বিকেলের মধ্যেই রতন-সংক্রান্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি ? তুমি দেখছি আমাকে পাগল করে ছাড়বে !

আমি পাগল করব কি—আর একজন পাগল করে তুলেছে তো আমাকে।

হেসে উঠল সেবা। যেন একটা গভীর প্রশান্তির স্নিগ্ধ ছায়া পড়ল তার মুখের ওপর। বললে সে, তুমি বিকেলে ফোন করো একটা—এই ধর চারটে নাগাৎ !

খুব খুশি হলুম শুনে। একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা তা হলে করে ফেলো।

সুব্রত উঠে পড়ল তখনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ও একটু অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গেই সেস্থান ত্যাগ করল।

চারটে বাজে নি তখনও, সুব্রত উঠি উঠি করছে, এমন সময়ে মালা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে, ফোন এসেছে—সেবা ডাকছে আপনাকে।

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হাসল সুব্রত। তার পর উঠে গেল সিঁড়ির মুখটায়—যেখানে টেলিফোন যন্ত্রটা রাখা ছিল।

হ্যালো ?… হ্যাঁ আমি, বলো কি খবর ?

তারের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো সেবার কণ্ঠস্বর, খবর ভালো নয়, সাধনার দাদা জানিয়েছেন, রতন গুপ্ত এবারে সত্যি সত্যিই ফেঁসেছেন।

কে জানিয়েছে ?

আমার বন্ধু সাধনা—তার দাদা অনিমেষ। রতন গুপ্ত এক বর্মীর সঙ্গে ব্যবসা করতে নামে। কিন্তু তার স্বভাব যা—তারই পরিচয় দেয় কয়েকদিনের মধ্যে, সেই বর্মীর সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচশো টাকা তোলে। ফলে বাবু এখন শ্রীঘর বাস করছেন।

তার পর ?

এখন ওই টাকাটা দিয়ে দিলে নাকি শ্রীঘরে বাস আর করতে হবে না, তবে ওখানে আর তার বাস করাও চলবে না।

কেন ?

চারিদিকে বদনাম হয়ে গেছে। ঠক-জোচ্চোর বলে বেশ সুনাম রটেছে তো !

জাহান্নামে যাক্। এখন অনিমেষবাবু কি করতে বলেন ?

তিনি টাকাটা দেবার পক্ষেই যেন মনে হলো। বললেন, একে তো বাঙালীর সুনাম চারিদিকে, তার ওপর এই কেসটাও যদি যোগ হয়, তা হলে খুবই লজ্জাকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

হুঁ, যত সব উড়ো ঝঞ্ঝাট ! যাক্ গে, তুমি অনিমেষবাবুকে জানিয়ে দাও, আমরা টাকাটা তাঁর নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি—তিনি যেন নিজে দয়া করে আমাদের এই কাজটুকু করে দেন তাঁর নিজস্ব কাজ ভেবে।

তিনি করবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক তুমি।

ভেরী গুড। আসছ কখন ?

সন্ধ্যে নাগাৎ।

না-না, অত দেরি করলে চলবে না। এখনই চলে এসো।

পাগল নাকি, এত তাড়াতাড়ি যাব কি করে ?

লক্ষীটি, দেরি করো না। তোমার এখানে অনেক কাজ। এখনই কেটারারের লোকজন সব এসে পড়বে—তাদের ম্যানেজ করা ও আয়োজনটা সুষ্ঠুভাবে শেষ করার সব ভার তোমার ওপর। আমার মাথার তো ঠিক নেই, আর মালাও সেরকম পাকাপোক্ত নয় এ-ব্যাপারে—সুতরাং তোমার ওপর নির্ভর করছে সব।

হ্যাঁ, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সেবা তো আছেই দাসীর মত আজ্ঞা পালন করতে—কি বলো !

ছি ছি, কি সব বলছ···

হ্যাঁ, এখন ছি-ছি তো বলবেই, তার পর কাজ চুকে গেলে তখন আর চিনতে পারবে না !

না সেবু, অনেক অন্যায় করেছি—এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করব, কথা দিলুম, বিশ্বাস করো।

তবুও ভালো—আবার কথা দিলে ! বিদ্রূপকণ্ঠে বলে ওঠে সেবা।

ভালোমানুষ সুব্রত যেন ঘেমে নেয়ে ওঠে টেলিফোনের এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে। কি বলবে, কি করবে বেচারা ভেবেই পায় না।

রিসিভারটা রাখতে রাখতে বিজয়িনীর হাসিতে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেবার। তার সুব্রতকে আবার সে মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল—এবার আর তাকে ছিনিয়ে নিতে সে দেবে না কাউকেই।

মনে মনে ভাবে সুব্রত—গৌতম সেনের পরামর্শটাই গ্রহণ করবে নাকি ? কি হবে অতীতের পেছনে ছুটে—তার চেয়ে সেবাকে নিয়ে নীড় রচনা করলে আবার সে পুরোপুরি সুখী হয়ে উঠতে পারবে।

॥ এগারো ॥

শেষ পর্যন্ত সকলে এলো একে একে।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো সুব্রতর বক্ষ ভেদ করে। আশঙ্কা ছিল তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত—কেউ যদি পিছিয়ে পড়ে বা কোন অজ্ঞাত কারণে ফাংশন বন্ধ হয়ে যায়!...

অজয় ভোস এলো তার দীর্ঘ ঋজু চেহারা নিয়ে। তার সেই সুঠাম সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে সুব্রত, নাঃ, সত্যিই আকর্ষণ আছে লোকটার চেহারায়!

অলকা ভোস এলো অজয়ের পাশাপাশি। সর্বাঙ্গ তার মূল্যবান জড়োয়ায় মোড়া। সেদিকে তাকিয়ে সুব্রতর চোখ দুটো যেন ঝলসে যায় মুহূর্তের জন্যে। রাজেন্দ্রাণীর মত মাথা উঁচু করে শিশমহলে প্রবেশ করল সে।

সবশেষে এলো মনীশ লাহাড়ী। সুব্রতর মনে হলো যেন কোন বন্য জন্তু তার শিকারের খোঁজে দ্রুত অথচ চোরা পদক্ষেপে পা-পা করে এগিয়ে এলো ফাংশনের আসরে। আপন মনেই গজগজ করে ওঠে সে —লোকটার চালচলন, হাবভাবে সভ্যতার ছোঁয়াচ নেই একটুকুও!

কিন্তু বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে সুব্রতর ঠোঁটের কোণায়। তার রচিত ফাঁদে সকলকে একে একে এসে প্রবেশ করতে দেখে গর্বানুভব না করে পারে না সে।

ফাংশন শুরু হলো একটু পরেই সুব্রতর নির্দেশে। নাচ-গান-আবৃত্তি-বাদ্যধ্বনি—সব ঠিক ঠিক পুনরাবৃত্ত হয়ে চলল একের পর এক। দর্শকদের চোখের সামনে এক বছর আগেকার আর একটি বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি যেন ভেসে ভেসে উঠতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে ফাংশনের শেষে হলের চারিদিকে আলো জ্বলে উঠলে চঞ্চল হয়ে উঠল সুব্রত। এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেলবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেবা এগিয়ে এসে নিবেদন করল, ডিনার তৈরী—আপনারা আসুন সবাই।

সুব্রত অতিথিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ডাইনিং হলে—সেদিন যে-

ঘরে কুন্তলার জন্মোৎসব উৎসবের অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়েছিল। তার পর সেদিনকার সে-ই ডিনার-টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে এক-এক করে প্রত্যেককে নির্দেশ দিতে লাগল সে প্রত্যেকের বসবার স্থান সম্পর্কে।... অলকা দেবী, আপনি এখানটায় বসুন—আমার ডানদিকে, তার পরে মিঃ লাহাড়ী। মালা, তুমি আমার বাঁদিকে বসবে। তোমার পাশে বসবেন অজয়বাবু। তাঁর পাশে সেবা তুমি...

এক মুহূর্তের জন্য থামল সুব্রত। সেবা আর মনীশের মধ্যেকার চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করল সে, এই ফাংশনে আমি আর-একজনকে আমন্ত্রণ করেছি—তাঁর নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন, গৌতম সেন, বিখ্যাত গোয়েন্দা। তিনি এখনও দেখছি উপস্থিত হন নি—যাক্ গে, আমরা শুরু করি, রাত তো অনেক হলো। আশা করি কারো আপত্তি হবে না এ বিষয়ে।

মালা তার নির্দেশিত চেয়ারে বসে রাগে ফুলতে থাকে। সুব্রত যে ইচ্ছে করেই এই বন্দোবস্ত করল—তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। কেমন কৌশলে সে সেবাকে বসাল মনীশের পাশে তার জায়গায়—ভাবতে গিয়েও মনে হলো মালার, সুব্রত তা হলে এখনও মনীশকে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে নিতে পারে নি, এখনও সে তাকে সন্দেহের চোখেই দেখে!

সে আড়চোখে তাকাল টেবিলের ও-প্রান্তটায়। মনীশের মুখটা ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনীশ তার দিকে তাকাল না কেন?

মনীশ তার পাশের শূন্য চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বললে, তা হলে সুব্রতবাবু, এবার একটা হেস্তনেস্ত করবেনই। কিন্তু আমি বোধ হয় আর বসতে পারলুম না, হঠাৎ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল। যদি অনুমতি করেন, উঠি তা হলে......

সত্যিই আপনি কাজের লোক! সুব্রতর কণ্ঠেও বিদ্রূপ ফুটে উঠল, কিন্তু আমরা আপনাকে এভাবে পাগলের মত কাজের পেছনে ছুটতে দিতে পারি না! তার পর একটু মুচকি হেসে নিম্নস্বরে বললে, অবশ্য আপনার জরুরী কাজটা যে কি ধরনের তা জানেন বোধ হয় এখানকার অনেকেই।

হ্যাঁ, সেটা আমিই তো সগৌরবে বলে থাকি সকলের কাছে—আবারও বলছি সকলের অবগতির জন্যে, যত কিছু অন্যায় কাজ সব আমারই

যারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।—চুরি, ডাকাতি, নারী-হরণ সবেতেই সিদ্ধহস্ত আমি।...

অলকা স্মিতহাস্যে, বললে, আমি কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল থেকে শুনেছি, আপনি গোলাগুলি অস্ত্র-শস্ত্র সংক্রান্ত কোন কিছু কাজ করে থাকেন, ঠিক তাই না মিঃ লাহাড়ী? অ'শ্য অজকাল ওই জাতেরই কাজের ইজ্জত বেশি বলে কারো কারো অভিমত।

আস্তে অলকা দেবী, আস্তে। কেউ যদি শুনে ফেলে আমার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। জানেন তো প্রবাদটা—কেয়ারলেস্ টক মে টেক ওয়ানস্ লাইফ! ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলে মনীশ কথা কটা।

মনীশের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল আর হুড়মুড় করে উঠে পড়ল সকলে টেবিল ছেড়ে। একটা ভয়ার্ত আর্তরবে ভরে উঠল ঘরটা।

মাত্র মুহূর্তকয়েক। তার পরেই আবার আলোটা জ্বলে উঠল। দেখা গেল, মনীশ ও মালা খুবই ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে।

মালার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ স্বর, জামাইবাবুর মনটা যে এত ছোট তা আমি জানতুম না!

কেন? মনীশ নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

তোমার পাশাপাশি বসতে দিলে না আমায়।

ভালোই হয়েছে— সামনাসামনি বসার ফলে আমি তো তোমাকে আরো ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি।

তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে পাবে না।

কেন?

আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে?

গৌতম সেন কি আসবে?

মনে হয় না—আসবার হলে এতক্ষণে এসে পড়তেন।

আমার কিন্তু ভালো লাগছে না ব্যাপারটা মোটেই।

আচ্ছা, গৌতম সেনকে চেনো তুমি? লোক কেমন তিনি?

ভগবান জানেন।

তবে যে বলছিলে সেদিন, তাঁকে চেনো তুমি......

কথা বন্ধ হয়ে গেল উভয়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে আলোটা জ্বলে

ওঠরে সঙ্গে সঙ্গে। সকলে যে-যার নিজ নিজ চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল আবার।

গোল টেবিল। টেবিলটাকে ঘিরে সাতটা চেয়ার পাশাপাশি পাতা। সাতটা চেয়ারের সামনে সাতটা ডিস, সাতটা কাঁচের গ্লাস, সাতটা করে কাঁটা-চামচ-ছুরি।

বসল সকলে। ঠিক ছজন লোক বসল ছটা চেয়ারে। একটা চেয়ার আগের মত শূন্যই পড়ে রইল সেবা ও মনীশের মাঝে।

সুব্রতর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মত উপক্রম হয় শূন্য চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে। সে যেন অনুপস্থিত অতিথিকে প্রাণমন দিয়ে কামনা করছে সেই মুহূর্তে।

জামাইবাবু, কি হলো আপনার?

অন্যমনস্ক সুব্রত চমকে ওঠে মালার প্রশ্নে। থতমত খেয়ে উত্তর দেয়, এঁ্যা···হ্যাঁ, এই যে, শুরু করা যাক্‌ এবার···

কাঁটা-চামচের ঠুন-ঠান আওয়াজ শুরু হয়ে যায় কাঁচের প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষে। বাহ্যত প্রত্যেকেই ব্যস্ত, কিন্তু শান্ত নেই মন কারুরই। সকলেই যেন প্রত্যাশা করছে কোন কিছু অমঙ্গলের প্রতি মুহূর্তে।

হঠাৎ কি ঘটল আন্দাজ করতে পারে না কেউই। সুব্রত দু হাতে বুকটা চেপে মুখখানা বিকৃত করে ঢলে পড়ল চেয়ারের ওপর।

জলের গ্লাসটা তুলেছিল সে ঠোঁটের ডগায়, বোধ হয় দু-এক চুমুক খেয়েও ছিল—সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল চোখের নিমেষে।

মাত্র মিনিট খানেক। তার মধ্যেই নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেল নীল-হয়ে-যাওয়া সুব্রতর দেহটা।

॥ বারো ॥

পুলিস হেড-কোয়ার্টার লালবাজারে গিয়ে পৌছল যখন গৌতম, তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে সে কমিশনারের ঘরের সামনে এসে হাজির হলো ও বাইরে অপেক্ষমান সার্জেণ্টের হাতে তার নাম-লেখা সুদৃশ কার্ডটি দিল।

পর মুহূর্তেই আহ্বান এলো কমিশনারের কাছ থেকে। সার্জেণ্টটি বেরিয়ে এসে দরজা ঈষৎ ফাঁক করে গৌতমকে ভিতরে যাবার জন্যে ইঙ্গিত্ করলে।

কমিশনার বিমান দত্তগুপ্ত একখানি উন্মুক্ত ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অভিনিবেশ সহকারে দেখছিলেন তা। গৌতমের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখটা তুলে হাস্যমুখে আহ্বান জানালেন, হ্যালো ইয়ংম্যান, এসো এসো।

গৌতম ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললে, একটু দেরি হয়ে গেল স্যার…

দ্যাটস্ অলরাইট! এখন বলো, কি উপকার করতে পারি আমি তোমার?

ফোনে একটু আগে যে-বিষয়ে জানালুম, মানে ওই হত্যারহস্য……

হ্যাঁ, এই যে, সেটারই ফাইল দেখছি আমি……

কেসটা স্যার বড্ড জটিল। তা ছাড়া এই কেসের সঙ্গে দু একজন বিশিষ্ট লোকও জড়িয়ে আছেন। সেক্ষেত্রে আপনার সাহায্য ছাড়া এগোবার কথা আমি তো ভাবতেই পারি না!

সত্যিই, অত বড় ব্যারিস্টার অজয় ভোস যে এভাবে জড়িয়ে ফেলবে নিজেকে এ কেসের সঙ্গে এটা আমি ভাবতেও পারি নি। এখন জামাইকে বাঁচাবার জন্যে শশুর সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শঙ্করনারায়ণ সেনও যে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়াবেন এটাও স্বতঃসিদ্ধ।

সেজন্যেই আমার এত দ্বিধা। আচ্ছা স্যার, ধরুন যদি মিঃ ভোস বা তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কেউ প্রত্যক্ষভাবে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলে প্রমাণিত হন, তা হলেও কি আমরা তাঁদের শাস্তি দেওয়াতে পারব?

কেন নয়? দোষী বলে যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে শাস্তি তাদের গ্রহণ করতেই হবে। জাস্টিস ইজ জাস্টিস—সেখানে ক্ষমা নেই।…আমি

কিন্তু সেকথা ভাবছি না। আমার চিন্তা হচ্ছে এরা অর্ডিনারী ক্রিমিন্যাল নয়, এদের সম্বন্ধে এগোতে হলে খুব সাবধানে এগোনো দরকার। অন্য ক্রিমিন্যালদের সম্বন্ধে যেভাবে সাধারণত প্রসিড করি আমরা, তার থেকে ভিন্ন পথে সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে আমাদের। পারবে কি তা তুমি?

কেন পারব না স্যার? আপনার সাহায্য পেলে নিশ্চয়ই পারব।

চিন্তিতভাবে উত্তর দেন কমিশনার, হ্যাঁ, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।...তা হলে কি এই কেসটার পুরোদায়িত্ব তুমিই নেবে?

আমার আপত্তি নেই স্যার।

গুড। এখন বলো তো, তুমি কাল ওদের ফাংশনে উপস্থিত ছিলে, না? যেন সেরকমই বললে বলে মনে হলো টেলিফোনে।

হ্যাঁ স্যার, ছিলুম। কিন্তু তাঁদের কেউ তা জানেন না। মানে, আমি ছদ্মবেশে ছিলুম। সুব্রতবাবুর সঙ্গে আগেই এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে গতকাল রাত্রে তাঁর ওই ফাংশনে উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যটা আমার খুব মনঃপুত না হওয়ায় আমি সোজাসুজি প্রত্যাখান করি।

বোধ হয় ভালো করতে তুমি, যদি ওপনলি উপস্থিত থাকতে। তা হলে বোধ হয় আর-একটা হত্যাকাণ্ড ঘটত না।

আমি স্যার বার বার নিষেধ করি সুব্রতবাবুকে, বিশেষভাবে অনুরোধও করি এই ধরনের ফাংশন অনুষ্ঠিত না করতে। কারণ তাঁর কথার ভাবে আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, কিছু একটা ঘটবে যেটা তাঁর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর সেজন্যেই ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল আমাকে শেষ পর্যন্ত।

আশ্চর্য, তবুও তুমি ধরতে পারলে না আততায়ীকে!

ঘটনাটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যে, আমাকেও পরাজয় মানতে হয় স্যার। আততায়ী যেই হোক, এক্ষেত্রে অসম্ভব সুচতুর সে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কালকের ফাংশনে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিল কজন?

মাত্র পাঁচজন এবং সুব্রতবাবু ও মিস মালা সেনকে নিয়ে সাতজন।

ব্যস?

হ্যাঁ স্যার। এই কজনের মধ্যেই কেউ ছিলেন সুব্রতবাবুর সন্দেহ-

জানন। আরো একটা বিষয় লক্ষণীয়, তাঁর স্ত্রীর বার্থ-ডে-পার্টি'র চারজন মহিলাকে বাদ দেন সুব্রতবাবু এই ফাংশনে।

কেন?

সম্ভবত তাঁদের মধ্যে কাউকে সন্দেহভাজন বলে মনে করেন নি তিনি।

ওই চারজন মহিলা কে কে ছিলেন, মানে, মৃত সুব্রত রায় বা তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কি তাদের?

ওই চার জন মহিলাই মৃতা কুন্তীবাঈয়ের বান্ধবী ছিলেন।

বিচিত্র কেস! এর আগে মিসেস রায় যখন মারা যান, তখন আমাদের ওটাকে সুইসাইড না বলে গত্যন্তর ছিল না কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সেটাই প্রমাণিত হয়। তারপর দীর্ঘ এক বছর পরে আবার সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

এটাকেও কি আপনি সুইসাইড বলে মনে করেন?

না, এখন আর তা মনে হচ্ছে না। মৃত সুব্রত রায়ের মৃত্যুতে এটাই প্রমাণিত হলো যে কোন আততায়ী সঙ্গোপনে অদৃশ্য থেকে এই দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটাল।

তা হলে কি আপনি বলতে চান যে কুন্তীবাঈ সুইসাইড করে নি—নিহত হয়েছিল আততায়ীর হাতে?

হ্যাঁ, তাই। সুব্রত রায়ের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি দুটো থেকেই তা সপ্রমাণিত হয়। ওই চিঠি দুটো পাবার পরই মৃত সুব্রতর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং সে খোঁজখবর শুরু করে। বোধ হয় সে হত্যাকারীকে ধরেও ফেলেছিল এবং তা সকলের সামনে প্রকাশও করত গতকাল রাত্রে। কিন্তু আততায়ী তা আন্দাজ করতে পেরে সে-সুযোগ আর দিতে চাইল না তাকে, তার বিরুদ্ধে যা কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ সব শেষ করে দেবার জন্যেই সরিয়ে দিল সুব্রত রায়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

সুব্রতবাবু গতকালের ফাংশনে একটা শূন্য চেয়ার রেখেছিলেন ডিনার টেবিলে। কাউকে তিনি প্রত্যাশা করছিলেন বোধ হয় সেই শূন্য চেয়ারে শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত—এটাও অনুমান করতে পারি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, সম্ভবত সেই ব্যক্তিই হয়তো এসে হাতেনাতে ধরিয়ে দিত আততায়ীকে। কিন্তু কাকে সুব্রত রায় প্রত্যাশা করছিল, তা জানতে

পারলে ?

না স্যার, সেটা এখনও রহস্যাবৃত রয়েছে।

হুঁ। আচ্ছা, তা হলে সন্দেহভাজন এক্ষেত্রে পাচ্ছি আমরা কাকে কাকে ?

কালকের ফাংশনে উপস্থিত সকলকেই সন্দেহভাজনের তালিকায় ফেলতে হয়।

বেশ, তা হলে অজয় ভোসকে দিয়েই শুরু করা যাক্।

অজয় ভোসের সঙ্গে কুন্তীবাইয়ের সম্পর্কটা কি ধরণের ছিল তা······

আরে তা জানি বৈকি, বাধা দিয়ে কমিশনার বলে ওঠেন, অজয়ের সঙ্গে কুন্তীবাঈয়ের গোপন প্রেমাভিসারের কাহিনী কে না জানে! অজয় তো প্রকাশ্যে নর্তকীকে তার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে রেখে নিয়মিত ভাবে সেখানে যাতায়াত করত এবং তা এক রকম ওপন্-সিক্রেটই ছিল। তারপর বোধ হয় অজয়ের অরুচি ধরে যায়, সে মুখ পাল্টাবার জন্যে কুন্তীবাঈকে ছেড়ে দিতে মনস্থ করে। কিন্তু কুন্তীবাঈ তাকে ছাড়তে একেবারেই গররাজী ছিল। ফলে যে মতবিরোধ ঘটল তারই ফলস্বরূপ এই দু-দুটো হত্যাকাণ্ড যে ঘটে নি তারই বা প্রমাণ কি!

কিন্তু একজনকে গভীরভাবে ভালোবাসার পর তাকে নিজ হাতে বিষ দিয়ে হত্যা করা কি সম্ভব ?

খুব সম্ভব। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে হেন কুকর্ম নেই যা করা অসম্ভব কারো পক্ষে।

অজয় ভোসের স্ত্রী ? তিনিও তো করতে পারেন এ কাজ ? স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়ছে দিন দিন, চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখবার পরেও স্থির থাকা অসম্ভব নয় কি ?

ইয়েস, ইউ আর রাইট। অজয় ভোসের স্ত্রীও সমান অংশে সন্দেহভাজন বলে মেনে নেব আমরা। স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এরকম কাজ করা তার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। জেলাসী মানুষকে সময়ে সময়ে কোথায় যে ঠেলে নিয়ে যায় তা কল্পনাও করা যায় না!

তিন নম্বর সম্ভাব্য আততায়ী হিসেবে সেবা করকে ধরা যায় স্যার।

গৌতমের মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমিশনার স্মিত–

হাস্তে বললেন, নিশ্চয়ই। সুব্রতকে এই মেয়েটি ভালোবাসত আগাগোড়া। তার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ারও কথা প্রায় পাকা ছিল। যদি এই কুন্তীবাঈ মাঝে এসে না দাঁড়াত, বোধ হয় তার সঙ্গেই সুব্রতর বিয়ে হয়ে যেত।

কিন্তু সেবা কর কুন্তীবাঈকে হত্যা করতে পারে—সুব্রতবাবুকে হত্যা করবে কেন?

ভেরী ইন্টারেষ্টিং, ঠিক বলেছ তুমি। আচ্ছা, সে-বিষয়ে পরে আসা যাবে। এখন বলো, মনীশ লাহাড়ীকে তোমার কিরকম মনে হয়? তাকেও কি সন্দেহের তালিকায় ফেলতে চাও?

হ্যাঁ স্যার, এই লাহাড়ী সম্বন্ধে বরাবর আমার একটা কৌতূহল আছে। লোকটা একেবারে রহস্যাবৃত। ওঁর পাস্ট-হিস্ট্রি সম্বন্ধে কিছু জানা আছে আপনার?

কমিশনার মৃদু হেসে বললেন, খুব বেশি কিছু জানি না, তবে তার সম্বন্ধে আমারও কৌতূহল কম নেই। আমার ডিপার্টমেণ্ট সর্বদা সজাগ আছে এখন মনীশ লাহাড়ীর পেছনে। উপস্থিত যেটুকু জানি—জানিয়ে দিই তোমায়। এই লাহাড়ী কোন এক জমিদারের তনয়। বেশ ভালো লেখাপড়া জানে। বাপের অগাধ পয়সা পাবার পর ব্যবসা করতে নামে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লোকসান দিয়ে পিছু হটে আসে। তার পর এক বিপ্লবী পার্টির সংস্পর্শে আসে ও এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই আছে।

কুন্তীবাঈয়ের সঙ্গে মনীশ লাহাড়ীর আলাপ হয় কি সূত্রে কিছু জানেন নাকি?

ঠিক তা জানি না, তবে মনে হয়, কোন ফাংশনের মারফতই হয়েছে তা। মনীশ লাহাড়ী খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে। আর চেহারাটাও বেশ সুদর্শন। সেই সূত্রে কিরকমে আলাপ হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু আলাপটা তাদের উভয়ের মধ্যে আলাপেই সীমাবদ্ধ থাকে না—শিগগিরই প্রগাঢ় প্রণয়ে পর্যবসিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে।

তার পর?

তার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—সচরাচর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রে মনীশ লাহাড়ীরই দোষ। সে ডুব দেয় দীর্ঘকালের জন্যে

কোন সুদূর প্রবাসে তার স্বভাব অনুযায়ী। আর কুন্তীবাঈ আবার আর-একটি অবলম্বন ধরে।

তা হলে কি মনীশ লাহাড়ীকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেব?

না-না, বাদ দেওয়া যায় কি করে এখনই? আরো এনকোয়ারীর পর, যদি মনে করো, তখন বাদ দিও। বাই-দি-বাই, তুমি কিছু প্রসিড করেছ নাকি এই কেসটা সম্পর্কে?

হ্যাঁ স্যার, আজ সকালে কেটারার দত্ত এণ্ড বড়ালের অফিসে গিয়েছিলুম।

তার পর?

কালকের ফাংশনে যে হেড খানসামা ছিল তাকে জেরা করি। তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি, ডিনার-টেবিলে যে শূন্য স্থানটি ছিল সেটি নাকি কোন এক মহিলার দ্বারা পূরণ হবার কথা ছিল।

ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে কমিশনারের, প্রশ্ন করেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে, হেড খানসামা কি করে জানল তা?

সুব্রতবাবু নাকি তাকে সেকথা জানান এবং আরো বলেছিলেন, মহিলাটি আসা মাত্র তাকে যেন সেই শূন্য চেয়ারটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

কি হলো তার পর?

মহিলাটি আসেন নি শেষ পর্যন্ত এটুকুই জানে সে—তার বেশি কিছু বলতে পারল না।

মহিলাটিকে চেনে হেড খানসামা?

না।

তা হলে সে চিনতে পারত কি করে?

সুব্রতবাবু তাকে একটি ফটো দেখান এবং বলেন, ওই ফটোর চেহারার মত সুন্দরী ও সুবেশা একটি মেয়ে আসবে এবং তাকে যেন তৎক্ষণাৎ ওই শূন্য চেয়ারটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

বিচিত্র! আচ্ছা, এই খানসামারা সবাই কি কেটারারের পুরনো লোক?

হ্যাঁ, কেটারারের ম্যানেজারের অন্ততঃ তাই অভিমত।

আচ্ছা, টেবিলের ধারেকাছে কোন বাইরের লোক যায় নি?

না স্যার—কেটারারের লোক, সুব্রতবাবুর বাড়ির লোকজন আর

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ছাড়া শিশমহলে কাল বাইরের লোক কেউ ছিল না।

হেড খানসামা আর কিছু বললে ?

হ্যাঁ স্যার, টেবিলে বসার পরমুহূর্তে হলের আলো নিভে যায়। সকলে যে-যার জায়গা থেকে উঠে পড়ে। সেই সময়ে কোন এক মহিলার হ্যাণ্ডব্যাগ নাকি খসে পড়ে যায় তাঁর হাত থেকে। একটি খানসামা সেটি লক্ষ্য করে ও কুড়িয়ে টেবিলের ওপর তুলে রাখে।

তার পর ?

ব্যাগটি আবার মালিকের হাতে ফিরে যায় আলো জ্বলার পর।

কার ব্যাগ ছিল সেটি ?

তা বলতে পারল না কোন খানসামা। কারণ তারা সেটি ধর্তব্যের মধ্যে ধরে নি এক মুহূর্তের জন্যেও। নগণ্য ব্যাপার বলে গোড়া থেকেই অনাগ্রহ ছিল তাদের সে-সম্বন্ধে।

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যান কমিশনার। একটুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে বলে ওঠেন তিনি, তোমার কি অভিমত এ বিষয়ে ?

ঠিক এখনই বলতে পারছি না তা আমি। আরো কয়েক ঘণ্টা সময় দিন আমায়, তার পর জানাব স্যার।

তুমি এখন কোথায় যাবে ?

প্রথমেই ভাবছি শঙ্করনারায়ণ সেনের সঙ্গে দেখা করব।

তাঁর সঙ্গে কেন ?

তাঁর মেয়ে-জামাই সম্বন্ধে দু-চারটে প্রশ্ন করব তাঁকে। হয়তো ভদ্রলোকের মেয়ে ও জামাইকে সেখানে উপস্থিত দেখতেও পারি।

যাও, দেখ—উইস ইউ গুড লাক্, ইয়ংম্যান।

গৌতম হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে যায় ধীরগতিতে কমিশনারের ঘর থেকে।

॥ তেরো ॥

ঠিক এতটা বোধ হয় আশা করে নি গৌতমও। সামনে ভূত দেখলে যেমন চমকে ওঠে লোকে, সেরকম চমকে উঠল সে বিচারপতি শঙ্কর-নারায়ণের সামনে গিয়ে।

বিচারপতি সেন বুঝতে পারেন গৌতমের অবস্থাটা। তাই মৃদু হেসে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আসুন গৌতমবাবু, আমি আপনাদের কাউকেই প্রত্যাশা করছিলুম। আর সেজন্যে অলি আর অজয়কেও ধরে রেখেছি। তার পর বলুন, কি ব্যাপার ?

মাত্র মুহূর্তখানেক, তার মধ্যেই সামলে নিয়েছে গৌতম নিজেকে। কণ্ঠের জড়তাটাকে পরিষ্কার করে হাসিমুখেই প্রত্যুত্তর দেয় সে, যাক্ ভালোই হলো, আমাকে আর কষ্ট করে ওঁদের কাছে ছুটতে হবে না।

বিচারপতি সেন কিছু উত্তর দেবার আগেই অলকা আবদারের সুরে বলে উঠল, না, তা শুনব না আমি, আপনাকে আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে। কবে যাচ্ছেন, বলুন ?

দেখি, প্রয়োজন হলে যাব বৈকি।

কেন, বিনা প্রয়োজনে কি যেতে নেই ?

সেকথা বলছি না আমি, তবে যদি দরকার হয়, হয়তো কালই গিয়ে হাজির হবো।

আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো রইল—যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিন আপনার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত থাকব আমরা জানবেন।

ধন্যবাদ।

গৌতম আড়চোখে তাকাল একবার অজয় ভোসের দিকে। কোন বৈলক্ষণ্য বা পরিবর্তন নেই সেখানে। স্থাণুবৎ কাষ্ঠপুত্তলিকার মতই বসে রয়েছে সে একখানি চেয়ারের ওপর।

বিচারপতি সেন শুরু করলেন, আমরা প্রত্যেকেই দুঃখিত এবং লজ্জিত এই ব্যাপারে গৌতমবাবু। অজয় যে এভাবে নিজেকে পাবলিক প্রেসে জড়িয়ে ফেলবে তা আশা করি নি আমরা কেউই। এবার নিয়ে

এই দ্বিতীয়বার এ ধরনের ঘটনা ঘটল। প্রথমবারের পরই অজয়ের সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা সে হয় নি। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার মেয়েরও দোষ আছে। তারও উচিত হয় নি এতটা মাখামাখি করতে যাওয়া। যাই হোক, ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন—আমাদের পাবলিক কনসার্নে আসতে হচ্ছে প্রতিদিন, সেক্ষেত্রে কেসটা যত শিগগির মেটানো যায় অর্থাৎ রহস্যের কিনারা'টুকু যত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা যায়, ততই মঙ্গল আমাদের পক্ষে। দয়া করে সেদিকে একটু নজর রাখবেন। সেজন্যে আমার মেয়ে ও জামাই, যেভাবে চাইবেন, সেইভাবেই সাহায্য করবে আপনাকে।

নিশ্চয়ই স্যার, আমার সাধ্যমত আমি তা করব বৈকি। যদি ওঁরা যথাযথ আমাকে সাহায্য করেন, আমাব তো মনে হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই রহস্যোদ্‌ঘাটনে সক্ষম হবো।

খুব খুশি হলুম আপনার কথা শুনে। উচ্ছ্বসিত আবেগে বিচারপতি সেন বলে ওঠেন, আপনি তা হলে শুরু করে দিন আপনার কাজ। অজয় ও অলি প্রস্তুত হও তোমরা।

আমরা প্রস্তুত বাপী। অলকা তার সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তর দেয়।

হ্যাঁ, একটা কথা গৌতমবাবু, বিচারপতি সেন বাধা দিয়ে আবার বলে ওঠেন, কিছু মনে করবেন না যেন মশাই, এই মৃত্যু দুটো সম্বন্ধে আপনার মতামতটা জানতে পারলে ভালো হতো।

গম্ভীর হয়ে যায় গৌতমের মুখ, প্রশ্ন করে ওঠে সে, কেন বলুন তো?

না, মানে, আমরা—আমাদের যা ধারণা হয়েছে, তার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব!

ওঃ, তাই বলুন। আমি কিন্তু এখনও কিছু ধারণা করে উঠতে পারি নি এ সম্বন্ধে।

আমাদের কিন্তু ধারণা, এ দুটো কেসই সাধারণ আত্মহত্যার কেস। বিচারপতি সেন যেন কতকটা আত্মস্খালনের সুরেই কথা কটা বলে ওঠেন। তার পর মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে কন্যার দিকে ফিরে বলেন, তোরাও তো ওই কথা বলছিলি না অলি?

হ্যাঁ বাপী, কুন্তলা যে আত্মহত্যা করেছে সেটা গৌতমবাবুও তো জানেন। আর সুব্রতবাবুর বিষয়ে একটু এগোলেই উনি ধরতে পারবেন।

বেচারী কুন্তীর শোকে যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাতে উনি যে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন তা ওঁর সঙ্গে সম্প্রতি যাঁরা মিশেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন। আর তা ছাড়া সুব্রতবাবুকে কেউ হত্যা করতে যাবে কেন? তার কারণ থাকবে তো কিছু। ভদ্রলোক যেমন নিরীহ তেমনই শত্রুশূন্য ছিলেন। অমন সাদাসিধে আত্মভোলা লোক সত্যিই বিরল এযুগে। সেই লোককে কেউ হত্যা করবে এ আমার বিশ্বাসই হয় না।

আপনারও কি তাই অভিমত মিঃ ভোস?

যেন চমকে ওঠার মত ঈষৎ কেঁপে উঠে বলে ওঠে অজয়, হ্যাঁ গৌতমবাবু, আমারও তাই মনে হয়। সুব্রতবাবু যেরকম লোক ছিলেন, তাতে তাঁর এই মৃত্যুটা একটু অস্বাভাবিক বৈকি।

তিন জোড়া জিজ্ঞাসু চোখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে গৌতম বললে, হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে আমিও হয়তো একমত হতুম, কিন্তু এমন কতকগুলো ঘটনা জানা আছে আমার—যে জন্যে পারছি না তা ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্বাস করতে।

যেন একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই আপত্তি জানিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন বিচারপতি সেন, ঠিক, ঠিক; এ তোমাদের অন্যায় অলি, গৌতমবাবুর ওপর জোর করে তোমাদের মতামত চালাতে যাওয়া উচিত হয় নি।

হ্যাঁ স্যার, আপনারও শোনা দরকার তা। সুব্রতবাবু মৃত্যুর আগে আমার কাছে গিয়েছিলেন এবং পরিষ্কার বলে আসেন, তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন নি—তিনি নিহত হন। আরো বলেন, সেই আততায়ীর পেছনে লেগে আছেন তিনি এবং হয়তো তাকে ধরেও ফেলবেন শিগগির। সেই উদ্দেশ্যে গতকাল রাত্রের পার্টির কথাটাও জানান আমাকে। আমাকে তিনি ওই পার্টিতে উপস্থিত থাকার জন্যেও বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর সে অনুরোধে কোন ব্যক্তিগত কারণে সম্মত হতে পারি নি আমি। হয়তো ভদ্রলোক আততায়ীকে কাল রাত্রেই ধরে ফেলতেন—যদি না হঠাৎ মারা যেতেন ওইভাবে।

নির্বাক হয়ে যায় যেন সকলে সহসা। অখণ্ড স্তব্ধতায় নিঃঝুম হয়ে পড়ে ঘরের আবহাওয়াটা হঠাৎ। কারো দিকে না তাকিয়েও গৌতম আন্দাজ করতে পারে, বিরাট হতাশা গ্রাস করে ফেলেছে বিচারপতি

সেন ও তাঁর মেয়ে-জামাইকে। অপেক্ষা করে থাকে সে সে-ভাবটুকু কাটার জন্যে।

মুহূর্ত কয়েক পরেই গলাখাঁকারি দিয়ে ওঠেন বিচারপতি সেন। তার পর অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, কিন্তু সুব্রতর ওই ধারণাই কি প্রমাণ করে না যে বেচারা অসুস্থ ছিল! যেখানে পুলিস ও আদালত রায় দেয় আত্মহত্যা বলে, সেখানে সুব্রতর ওরকম ধারণা হওয়া—আর যাই হোক, সুস্থ-মস্তিষ্কের লক্ষণ নয় বলে মনে হওয়া কি অযৌক্তিক গৌতমবাবু? আরো একটা কথা, সুব্রত যেন অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিল তার স্ত্রী মৃত্যুতে, আমার তো মনে হয়, সেটাই তার মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্টের প্রধান কারণ।

আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি ঠিক একমত হতে পারলুম না স্যার।

কেন? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে অজয়, কুন্তীর আত্মহত্যা আপনার অন্তত মেনে নেওয়া উচিত।

পারলুম না তা অজয়বাবু। ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে গৌতম।

বাধাটা কি? বিচারপতি সেন এবার প্রশ্ন করেন, পুলিস একবার যখন রায় দিয়েছে, তখন তারা নিশ্চিত না হয়েই কি বলেছে সে কথা?

তাদেরও তো ভুল হতে পারে। আর বস্তুতপক্ষে হয়েছেও তাই। সেটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল সুব্রতবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে।

চুপ করে যান বিচারপতি সেন। ঘরের মধ্যে আবার স্তব্ধতা বিরাজ করে কয়েক মুহূর্ত।

একটু পরে গৌতম স্মিতমুখে ফিরে তাকাল অলকার দিকে, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই মিসেস ভোস।

নিশ্চয়ই করবেন। সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল অলকা, বলুন, কি জানতে চান?

আপনার মনে কি একবারও সন্দেহ জাগে নি যে মিসেস রায়ের মৃত্যুটা অস্বাভাবিক—সেটা স্বাভাবিক আত্মহত্যার কেস নয়?

দুঃখিত আমি গৌতমবাবু, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না বলে। শুধু আমি কেন, সকলেরই ধারণা কুন্তী আত্মহত্যা করে তার বিড়ম্বিত জীবন শেষ করে।

ওঃ। আচ্ছা, আপনি কি অতীতে কখনও বেনামী চিঠি পেয়েছেন অলকা দেবী?

কণ্ঠের এক অদ্ভুত আওয়াজ করে অলকা বলে ওঠে, বেনামী চিঠি! কি বলছেন গৌতমবাবু, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

আপনি তা হলে কখনও সেরকম কোন চিঠি পান নি?

না—না। হঠাৎ এসব আজগুবি প্রশ্নের মানে গৌতমবাবু?

গৌতম এড়িয়ে যায় অলকার প্রশ্নটা। পাল্টা-প্রশ্ন করে বসে সে, আচ্ছা, সুব্রতবাবু কি সত্যিসত্যিই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর?

আমি কি করে বলব তা?

মানে, আপনি তাঁর ক্লোস-টাচে আসতেন তো মাঝে মাঝে, তা থেকে যদি আন্দাজ করতে পেরে থাকেন…

এক মিনিট নিস্তব্ধতার পর অলকা মুখ খুলল, হ্যাঁ, মানে, তাঁকে নার্ভাস আর আনমাইণ্ডফুল মনে হতো প্রায়ই।

কবে থেকে সেটা আপনার নজরে আসে?

কুন্তীর মৃত্যুর পরেই ওরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করি। আচ্ছা, তাই না জয়? অজয়ের দিকে ফিরে অলকা জিজ্ঞাসা করে তাকে প্রশ্নটা!

হ্যাঁ অলি, তোমার ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

আচ্ছা অলকা দেবী, আপনাদের সঙ্গে মৃত সুব্রতবাবুর সম্পর্ক কেমন ছিল?

বেশ মধুর। কোন রকম ঝগড়া-ঝাঁটি বা মন-কষাকষি দেখা দেয় নি এক দিনের জন্যেও। কেন, এ প্রশ্ন কেন করছেন?

এমনি।…আপনি কিন্তু মৃতা কুন্তীবাঈকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন!

তা একটু দেখতুম। সে আমারই স্বামীকে আমার চোখের সামনে কেড়ে নেবার মতলব করলে স্থির থাকতে পারে কি? আপনিই বলুন না—কোনও মেয়েছেলে তা পারে কিনা?

হ্যাঁ, সেটা স্বাভাবিক। আচ্ছা, সুব্রতবাবু কি কখনও বলেন নি যে, তাঁর ধারণা তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন নি?

না একবারও উচ্চারণ করেন নি তিনি সেকথা।

তিনি আপনাদের বাড়িরই পাশে একটা বাড়ি কিনলেন কেন সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি?

না।

আপনারা জিজ্ঞাসা করেন নি ?

না। আমাদের সন্দেহ জেগেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি নি চক্ষুলজ্জায়।

মনীশ লাহাড়ীকে চেনেন আপনি ?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় অলকা যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অপূর্ব কৌশলে সামলে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়, না, সেরকম পরিচয় কিছু নেই, তবে মাঝে মাঝে পার্টি বা ফাংশনে দেখা হয়ে থাকে এই পর্যন্ত।

তিনি আলাপ করবার চেষ্টা করেন নি কোন দিন ?

না, সেরকম আগ্রহশীল মনে হয় নি তাঁকে।

আচ্ছা, কুন্তীবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর কিরকম সম্পর্ক ছিল ?

বলতে পারব না তা, কারণ সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে।

আপনি কিন্তু জানেন মিঃ ভোস। দয়া করে যদি কিছুটা আলোকপাত করেন সে সম্বন্ধে ?

মাপ করবেন, মনীশ লাহাড়ী সম্পর্কে আমার জ্ঞান স্ত্রীর চেয়েও আরো কম।

কুন্তীবাঈয়ের বাড়িতে কখনও মনীশ লাহাড়ীকে দেখেছেন ?

হ্যাঁ, বহুবার।

তবুও কোন ধারণা বা জ্ঞান জন্মে নি আপনার তাঁর সম্পর্কে ?

বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি।

আচ্ছা অলকা দেবী, সেবা মেয়েটি কেমন ?

ভালো!

চরিত্র তাঁর কেমন ?

মোটামুটি বাইরে থেকে বেশ সচরিত্রের মেয়ে বলেই মনে হয়েছে।

সুব্রতবাবুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তাই না ?

শুনেছি সেরকম।

হলো না কেন ?

তা বলতে পারব না।

আচ্ছা, সেবা কি সত্যিই ভালোবাসতেন সুব্রতবাবুকে ?

দেখুন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। কোন মেয়ে যদি একজন

পুরুষকে ভালোবাসে, সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে ওঁদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ও প্রীতির ভাব একটা লক্ষ্য করেছি বরাবর। কে বলতে পারে, আবার ওঁদের দুজনের মধ্যে মিলন ঘটত না—যদি না কাল রাত্রের ঘটনাটা আদৌ ঘটত!

বহু ধন্যবাদ অলকা দেবী। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

না-না, বিরক্ত করার আছে কি!

গৌতমবাবু, আমার মেয়েকে আবার টেনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না তো মশাই? হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে ওঠেন বিচারপতি সেন।

ঠিক এখনই সে-বিষয়ে আপনাকে কোন কথা দিতে পারছি না, তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব সেরকম যাতে কিছু না ঘটে।

একটু দেখবেন মশাই—এই অনুরোধ রইল আপনার কাছে।

স্বল্প একটু হাসল গৌতম, কোন উত্তর দিল না বিচারপতি সেনের শেষোক্ত কথার। তার পর অজয় ভোসের দিকে ফিরে বললে সে, আপনাকে একটু কষ্ট দেবো মিঃ ভোস, কাল সকালের দিকে একবার লালবাজারে আসতে হবে আপনাকে।

আমাকে? চমকে ওঠে যেন অজয়, কেন?

কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে সেখানে।

বেশ তো, এখানেই সেটা সেরে ফেলুন না!

অসুবিধে আছে। কমিশনারের কক্ষে কাল ১১টার সময়ে মিট করব আমরা।

যেন অসহায় বোধ করে নিজেকে অজয়। শূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, আমার কোর্ট আছে কাল, ও-সময়ে কি যেতে পারব?

দেখুন ভেবে, যদি না পারেন, তা হলে সময়টা পাল্টাতে হবে।

অলকা শাসনের ভঙ্গিতে বললে, না, তোমাকে ওই সময়েই যেতে হবে লালবাজারে। বরঞ্চ গৌতমবাবু তোমাকে যত শিগগির পারেন ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

ফ্যাকাশে মুখে জড়িত স্বরে ব্যারিস্টার অজয় ভোস আমতা আমতা করে উত্তর দিলে, বেশ, তাই হবে, আমি কাল ১১টার মুখোই হাজির

হবো লালবাজারে, কিন্তু আমাকে আটকে রাখবেন না যেন বেশিক্ষণ।

সম্মতির ধরনে ঘাড়টা কাত করে গৌতম উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে ও বিচারপতি সেনের দিকে ফিরে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললে, তা হলে চললুম স্যার, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলুম।

না-না, আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন, বিরক্ত করার কি আছে। প্রয়োজন হলে আবার আসবেন—আমার দ্বার আপনাদের জন্য খোলা রইল জানবেন।

আচ্ছা, তা হলে আসি অলকা দেবী—গুড বাই মিঃ ভোস, এনগেজমেন্টের কথা ভুলবেন না যেন।

॥ চোদ্দ ॥

সেবা করকে গৌতম তার কোয়ার্টারেই পেয়ে গেল।

সেবা সেইমাত্র ফিরেছিল তার ডিউটি থেকে, তখনও নার্সের ড্রেস তার ছাড়া হয় নি—দাসী এসে গৌতমের নামলেখা কার্ডখানি মেলে ধরল তার সামনে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে সেবা বললে, বসাও গে বাবুকে ভিসিটার্স রুমে, আমি যাচ্ছি এখনই।

প্রায় দাসীর পিছু পিছু এসে প্রবেশ করল সেবা ভিজিটার্স-রুমে। মূর্তিমতী শোকের পরিবেশ সেবার সর্বাঙ্গে।—কালোপাড় শাড়ি, কালো বর্ডার দেওয়া ব্লাউজ, রুক্ষ চুল, চোখের কোলে কালি, মুখে গভীর ক্লান্তির ছাপ।

গৌতমের মনটা আপনা থেকেই নরম হয়ে এলো ওই করুণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে। অত্যন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে উঠল সে, বসুন সেবা দেবী।

সেবা আসন গ্রহণ করলে গৌতমও বসল, তার পর জানালে তাকে তার আগমনের উদ্দেশ্য।

সেবা প্রথম কথা বললে—গৌতমের মনে হলো যেন কান্নায় ভেজানো স্বর একটা বেরিয়ে আসছে কোন রকমে গলা থেকে, আপনি কাল রাত্রে

এলেন না কেন ?

বিস্মিত গৌতম পাল্টা প্রশ্ন করলে, আমি ?

হ্যাঁ, আপনার আসার কথা ছিল—আপনার জন্যে সুব্রতদা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাঁকপাঁক করেছেন।

ভুল করছেন আপনি, আমি আসব বলে কোন কথা দিই নি তো তাঁকে !

কিন্তু তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন আপনাকে—তাঁর চোখেমুখে সে প্রত্যাশা ফুটে উঠতে দেখেছি আমি।

অত্যন্ত দুঃখিত আমি। কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবার গৌতম, আপনি কি কাজে বেরিয়েছিলেন এখন ?

হ্যাঁ।

সত্যিই আপনি অসাধারণ।

না, অসাধারণত্ব নেই কিছু, সামান্য কর্তব্য করতেই ছুটেছিলুম।··· আজ একটা বড় অপারেশন ছিল—আগে খবর দেওয়া ছিল না তো, তাই ছুটতে হয়েছিল।

অপারেশন সাকসেসফুল ?

হ্যাঁ।

আবারও প্রশংসা করছি আপনাকে আপনার মানসিক স্থৈর্যের জন্য।

ম্লান হাসি একটুকরো হেসে উঠল সেবা। কোন প্রকার প্রতিবাদ করল না গৌতমের এই অযথা প্রশংসার জন্যে বা কোন রকম ভাবান্তরও ফুটে উঠতে দেখা গেল না তার মুখে এজন্যে।

পাকা জহুরী গৌতম। মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করে নেয় সে সেবার সম্পর্কে। যদি না পাকা অভিনেত্রী হয় এই মেয়েটি, তা হলে নিশ্চয়ই সে নির্দোষী। আর যাই করুক সে, খুন করতে যাবে না অন্তত তার ভালোবাসার পাত্রকে। আর কুন্তীবাঈকে ? এরকম মূর্তিমান সরলতার প্রতীক কোন মেয়ে অত বড় সাংঘাতিক হিংস্র কাজ একটা করতে পারে বলে মনেই হয় না তার। এখনও ওই ঢলঢলে মুখখানিতে কলঙ্কের কোন রকম ছাপ পড়ে নি।···গভীর অভিনিবেশ সহকারে পুঙ্খনা-পুঙ্খরূপে দেখে গৌতম নিজের মনে মনেই রায় দেয়।

বাইরে সে রায়টুকু অবশ্য গোপন রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললে সে,

সুব্রতবাবুর মৃত্যুটা খুবই আকস্মিক আপনার কাছে। আচ্ছা, কেন এমন হলো, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?

কি যে হলো কাল রাত্তিরে, এখনও তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না। চোখের সামনে দেখলুম, অমন জলজ্যান্ত লোকটা যেন ভোজবাজীর মত এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল!

কেউ কি হত্যা করল তাঁকে—আপনার কি মনে হয়?

কিচ্ছু বলতে পারছি না। ভাববার মত মানসিক অবস্থাও হারিয়ে ফেলেছি গৌতমবাবু। আমার যে কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল তা বুঝতে পারবেন না আপনারা কেউই। ওঃ ভগবান।...শেষদিকে সেবার কণ্ঠ ভেঙে পড়ল, গলার স্বর জড়িয়ে এলো। গৌতমের মনে হলো চোখের কোণ দুটোও যেন তার চিক চিক করে উঠল।

কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেবার জন্যে গৌতম বললে, কিন্তু আপনার এ সময়ে ভেঙে পড়লে তো চলবে না সেবা দেবী। আপনার সম্মুখে এখন মহান কর্তব্য—সুব্রতবাবুর মৃত্যুরহস্যের কিনারা করা বা তা করতে সাহায্য করা। তাঁর আত্মাও তা চাইছে জানবেন।

আমি মেয়েছেলে—কতটুকু কি করতে পারি বলুন?

তাতে কি হয়েছে, আপনি আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের সাহায্য করুন। জানবেন সেটুকুও মৃতের আত্মার পক্ষে সদ্গতির কাজ কাজ করবে।

মুহূর্তকয়েক কি যেন ভাবল সেবা। তার পর ম্লান স্বরে বললে, বলুন, কি করতে হবে আমায়?

বিশেষ কিছু না, কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন আমায়। খেয়াল রাখবেন, কোন কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে সুব্রতবাবুর হত্যাকারীকে ধরতে পারব না একেবারে।

হঠাৎ বড় বড় চোখ জোড়া গৌতমের মুখের ওপর মেলে ধরে নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করে ওঠে সেবা, তা হলে সুব্রতদা খুন হয়েছেন—আত্মহত্যা করেন নি?

আমার তো তাই মনে হয়। আচ্ছা, কাউকে কি সন্দেহ করেন আপনি এ বিষয়ে?

না...সেরকম কই কাউকে তো মনে পড়ছে না। এক...

বলুন, বলুন। ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকায় গৌতম সেবার দিকে।

না, সে অসম্ভব। না-না, কি সব ভাবছি আমি। আপন মনেই গুন গুন করে ওঠে সেবা।

বলুন স্পষ্ট করে সেবা দেবী—কার কথা বলছেন, কিছু লুকোবার চেষ্টা করবেন না।

কুন্তীবাঈয়ের এক পিসতুতো ভাই– অবশ্য সে এখন রেঙ্গুনে আছে, সুতরাং তার কথা ওঠেই না এক্ষেত্রে।

কী ব্যাপার—আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

সেবা এবার রতন গুপ্ত সংক্রান্ত সব ঘটনাগুলি এক-এক করে ব্যক্ত করল গৌতমের কাছে। এমন কি, আগের দিনের খবরগুলিও সব জানাতে ভুল করল না।

এক মনে সব শুনল গৌতম। তার পর সেবার বলা শেষ হলে জিজ্ঞাসা করে উঠল, আপনি কি এ ব্যাপারে রতন গুপ্তকে সন্দেহ করেন?

না, একেবারেই না। লোকটার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, সে ঠক-জোচ্চোর হতে পারে, কিন্তু হত্যাকারী নয়। তার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ তা।

এখন রতন গুপ্ত তা হলে রেঙ্গুনেই আছে? সেবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আচমকা প্রশ্ন করে ওঠে গৌতম।

হ্যাঁ।

আপনি ঠিক জানেন?

নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, সুব্রতবাবুর কি মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল সম্প্রতি?

ঠিক বুঝলুম না। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে সেবা।

মানে, ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর ব্রেন-ডিরেঞ্জমেণ্ট······

ছি ছি, একথা আপনাকে কে বলল?

তা হলে উনি সুস্থই ছিলেন পুরোপুরি?

নিশ্চয়ই। আপনার-আমার মতই স্বাভাবিক ছিলেন। তবে হ্যাঁ, কাল একটু আপসেট হয়ে পড়েছিলেন সুব্রতদা।

কেন?

কতকটা রতন গুপ্তের কারণে, কতকটা কুলকের ফাংশন নিয়ে।

আচ্ছা কুন্তীবাঈ আত্মহত্যা করে বলে কি আপনার ধারণা?

তাই তো মনে হয়।

আপনার ধারণা কি ?

আত্মহত্যা করে কুন্তী।

আচ্ছা, সুব্রতবাবু কখনও কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন এ সম্বন্ধে ?

কি সম্বন্ধে বলুন তো ? বেশ আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে সেবা।

এই কুন্তীবাঈ আত্মহত্যা করে নি, তাকে কেউ হত্যা করে বিষপ্রয়োগ করে!

না, সেরকম কোন আলোচনা করেন নি সুব্রতদা আমাদের সঙ্গে।

সুব্রতবাবু দুখানা বেনামী চিঠি পান। সে সম্বন্ধে কিছু বলেছেন আপনাদের ?

না তো! কি ধরনের চিঠি ?

কুন্তীবাঈ আত্মহত্যা করে নি, কেউ তাকে খুন করেছে—এই লেখা ছিল চিঠি দুখানায় এবং পত্রপ্রেরক তা জানাবার জন্যেই লেখে সে দুখানা।

কণ্ঠে একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি করে বলে ওঠে সেবা, এবার বুঝতে পারছি, সেজন্যেই সুব্রতদা হঠাৎ অমন অন্যমনস্ক আর খামখেয়ালী হয়ে পড়েন কিছুদিন যাবৎ।

আপনি এ সবের কিছুই জানতেন না ? গৌতমের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

বিশ্বাস করুন, একটুও না। আমি সেরকম কিছু সন্দেহ করি নি বলেই জিজ্ঞাসাও করি নি কিছু সুব্রতদার কাছে।

আচ্ছা, কুন্তীবাঈ কি অসুখী ছিল ?

হ্যাঁ, বেশিরকম।

কেন জানেন ?

ওই ধরনের মেয়ে যে অসুখী হবে তাতে আর বিচিত্র কি!

আপনাকে যেন একটু জেলাস বলে মনে হচ্ছে ?

হেসে ফেলল সেবা, চোখটা নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলে, কি যে বলেন!

অলকা দেবী কিন্তু স্বীকার করেছেন—তিনি জেলাস হয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ চোখ দুটো আয়ত হয়ে ওঠে সেবার, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে সে, তাই বুঝি সেদিন অলকা ওই কাণ্ডটা করল!

কী বলুন তো ?

কুন্তীবাঈ বড্ড মাথা ধরেছে বলে এ্যাসপিরিন জাতীয় কিছু চায় অলকার কাছে। অলকা তার বদলে কি একটা যেন দেয় তার হাতে ও বলে, এ্যাসপিরিন নেই এখন, তবে এটা খেলে একটু ঘুম-ঘুম পাবে ও মাথাটা ছেড়ে যাবে একেবারে।

কৌতূহলী হয়ে খাড়া হয়ে ওঠে গৌতম, ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তার পর ?

মাপ করবেন, আর কিছু জানি না। হয়তো কুন্তীবাঈ অলকার দেওয়া সেটা খেয়েই—

ঠিক জানেন আপনি ?

তা বলতে পারব না—আমার আন্দাজটুকু জানালুম মাত্র।

হুঁ। গম্ভীর হয়ে ওঠে গৌতমের মুখের চেহারা। গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে সে।

মিনিট দুই পরে সহসা গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল সে, কাল রাত্তিরে আলো ফিউজের সময় কার ব্যাগ হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল জানেন ?

পড়েছিল নাকি, কই জানি না তো কিছু !

টের পান নি একেবারে ?

একটুও না। সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না আমার।

গৌতমের মনে হলো, সেবা যেন চেপে গেল—ইচ্ছে করে বলল না অনেক কথাই শেষ দিকটায়।...কিন্তু তার কি স্বার্থ তাতে ? তবে কি তার হাত আছে এই হত্যা দুটোর পেছনে ? কিন্তু সুব্রতকে হত্যা করতে যাবে কেন সে ? কুন্তীবাঈ যদি তার পথ থেকে সরে গেলই, সুব্রতর সঙ্গে তার মিলনে আর বাধা কি ছিল !...তা হলে কী কুন্তীবাঈ ও সুব্রতর হত্যাকারী সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ?.. কুন্তীবাঈকে হত্যার কারণ সে আন্দাজ করতে পারে, কিন্তু সুব্রতকে হত্যা করার কি কারণ থাকতে পারে ? তাকে হত্যা করে কি মনোভিলাষ পূর্ণ হলো আততায়ীর ?

গৌতমের চিন্তায় বাধা পড়ল ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে। লজ্জিত হয়ে সে বলে উঠল, আচ্ছা, আজ চলি তা হলে সেবা দেবী—আবার দেখা হবে'খন।

সেবাও উঠে দাঁড়িয়েছিল দাসীর আহ্বানে। পাল্টা-নমস্কার করে

সেও দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আনমনে চিন্তা করতে করতে গৌতম নার্স কোয়ার্টার ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

॥ পনেরো ॥

মালাদের বাড়িতে এসে পৌঁছল যখন গৌতম, সন্ধ্যা হতে তখন আর খুব বেশি দেরি নেই। ভৃত্য ভরত বেরিয়ে এলো ও প্রশ্নের উত্তরে জানালে, ছোট্‌দিমণি বিকেল পাঁচটার আগেই মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

মুহূর্তখানেক চিন্তা করল গৌতম, তার পর কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, মালা দেবীর পিসীমা আছেন?

অপ্রসন্ন মুখে উত্তর দেয় ভরত, আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন।

তাঁকেই তুমি খবর দাও তা হলে, বলবে আমি সুব্রতবাবুর বিশেষ পরিচিত লোক, তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেই চলে যাব।

আপনার নাম কি বলব?

গৌতম সেন। তবে নাম বলার দরকার নেই, কারণ উনি নাম বললে হয়তো চিনতে পারবেন না।

আচ্ছা। বলে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ভরত সে-স্থান ত্যাগ করে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল অপেক্ষা করতে করতে। অধৈর্য হয়ে ওঠে গৌতম। কি করবে ভাবছে এমন সময় আগেকার মত অপ্রসন্ন মুখেই সামনে এসে দাঁড়াল ভরত ও বললে, আসুন কর্তা, অনেক কষ্টে তেনার মত করিয়েছি।

গৌতম প্রস্তুত হয়েই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল ভিতরের দিকে।

বিস্মিত হয়ে যায় গৌতম কিন্তু প্রভাসুন্দরীর সামনে গিয়ে। তাকে দেখে ভদ্রমহিলা যেন অত্যন্ত খুশি হয়েছেন বলেই মনে হলো তার। বেশ সপ্রতিভ ভাবে আহ্বান জানিয়ে বসালেন তিনি গৌতমকে তাঁর সামনে।

গৌতম এবার নিজের পরিচয় দিল প্রভাসুন্দরীকে।

বৃদ্ধা যেন সেকথা শোনার পর আরও খুশি হয়ে উঠলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা, আমার সুব্রতর মরার কারণটা খুঁজে বার করবার জন্যে তিনিই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। বড় ভালো ছেলে ছিল সুব্রত—বেচারা হঠাৎ চলে গিয়ে আমাকে কি জব্দেই না ফেলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে প্রভাসুন্দরীর বুক চিরে।

আমার সাধ্যমত আমি সে-চেষ্টা করব বৈকি। আর আমার আসাও সেজন্যে। কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই যে সে-সম্পর্কে।

আমি আর কি জানি যে তোমাকে বলব বাবা। সারাদিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর এই ঘরে বন্দী হয়ে বাস করছি। লোকালয়ের মুখ দেখি নি কত দিন। আমার ত্রিসীমানায় পর্যন্ত কেউ আসে না—এক ওই সুব্রত ছাড়া। কিন্তু ভগবানের বুঝি তাও সইল না—চক্রান্ত করে তাকেও সরিয়ে দিলেন তিনি।

কেন, মালা দেবী দেখেন না আপনাকে ?

হা ভগবান, সে দেখবে আমাকে! তার এখন কত সুখ, কত আহ্লাদ। রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে—এখন সে আমাকে গেরাহ্যি করবে কেন ?

ঠিক বুঝলুম না, কেন, তিনি কি আপনার ভাইঝি নন্ ?

নিজের ভাইঝি হলেও বা কথা ছিল, সম্পর্কের পিসীকে কে আর কবে পোঁছে বাবা, বলো ?

কৌতূহলী হয়ে ওঠে গৌতম ভেতরে ভেতরে নতুন খবরের আস্বাদ পেয়ে। মুখে কিন্তু সে ভাব না ফুটিয়ে নিতান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, উনি বুঝি আপনার আপন ভাইঝি নন ?

না—না।

তা হলে ?

প্রভাসুন্দরী এদিক থেকে ওদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিয়ে গলার স্বরটা খাটো করে ফেললেন ও মালার জন্মবৃত্তান্তটা খুব সংক্ষেপে বলে গেলেন।

চকচক করে ওঠে গৌতমের মুখখানা, জিজ্ঞাসা করে প্রভাসুন্দরী চুপ করার সঙ্গে সঙ্গেই, মালা দেবী জানেন এ খবর ?

হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে।

হুঁ। সহসা গৌতমের মুখ থমথমে আকার ধারণ করে। কিছুক্ষণের জন্যে গভীর চিন্তায় ডুবে যায় সে।

বাবা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

প্রভাসুন্দরীর আচমকা প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় গৌতমের। মৃদু হেসে লজ্জিত স্বরে বলে ওঠে, না, ভাবছিলুম একটা কথা। আচ্ছা, আপনার ভাইঝি কুন্তী দেবীর কোন শত্রু ছিল কি?

তা ঠিক বলতে পারব না বাবা; তবে মেয়েটা বদরাগী ছিল, মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলত—লঘুগুরু জ্ঞান করত না।

কেন, কোন গুরুজনকে অসম্মানজনক কথা কিছু বলে ফেলেছিলেন বুঝি?

ঠিক তা নয়, একবার একটা ঝিকে খুব অপমান করে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

ঝি—মানে, দাসী?

হ্যাঁ।

কি হয়েছিল?

সে নাকি কি সব কথা বলেছিল কুন্তীকে, তার ফলেই উগ্রচণ্ডী হয়ে ওঠে সে।

কত দিনের ঘটনা তা?

এই তো—তার মরবার মাসখানেক আগেই ঘটেছিল সে ব্যাপারটা। যাবার সময়ে ঝি-টা শাসিয়ে যায়, এর প্রতিশোধ সে নেবে।

কি নাম ছিল তার?

সুন্দরী।

কোথায় থাকে সে জানেন?

মানদা বলতে পারে হয়তো। দাঁড়াও বাবা, বলছি তোমাকে।

এর পর মানদা এলো ও তার কাছ থেকে ঠিকানা সংগৃহীত হলো। এক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে তাকিয়ে মানদা একটু অবাক হয়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে তার পর।

মানদা বেরিয়ে গেলে গৌতম সহসা প্রশ্ন করল, আপনার একটি ছেলে আছে, না?

হ্যাঁ বাবা, অনেক দিন তার চাঁদমুখ দেখি নি।

কি নাম তার ?

রতন।

কোথায় আছেন এখন তিনি ?

শুনেছি রেঙ্গুনে আছে। ব্যবসা করছে নাকি সেখানে।

কিসের ব্যবসা ?

তা জানি না বাবা। আমায় তা জানায় না ছেলেটা। সুব্রত জানত, সে-ই তো পাঠায় তাকে জোর করে সেখানে। মালাকে অনেক করে বলি, ছেলেটাকে একবার কলকাতায় নিয়ে আসার জন্যে, কিন্তু বিবির সে-কথায় কানই নেই। থাকবে কেন, এখন যে বিবি নতুন প্রেমে পড়েছেন—এখন কি আর তার চারপাশে নজর দেওয়া চলে ?

প্রেমে পড়েছেন ? কার ?

ওই যে, মনীশ না কি নাম যেন তার।

মনীশ লাহাড়ী ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। বুঝবে একদিন, যেদিন ওই ছোঁড়াই তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

কেন ?

ওর জন্মবেত্তান্তটা যখন তার কানে গিয়ে পৌঁছবে, সে ঠিক লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

শিউরে উঠল গৌতম অন্তরে অন্তরে। তার সম্মুখস্থিত বৃদ্ধার অন্তরের নগ্ন কদর্য রূপটা চোখে পড়ে যাওয়ায় বিষিয়ে উঠল তার মন মুহূর্তের মধ্যে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দমকা বাতাসের মত ঘরের মধ্যে ঢুকল মালা।

প্রভাসুন্দরীর দিকে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টিবান হেনে গৌতমের সামনা সামনি এসে সস্মিতমুখে বললে, আপনার কথা শুনলুম, কতক্ষণ এসেছেন ?

তা প্রায় আধ-ঘণ্টাটাক হবে।

আবার মালা তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাকাল একবার বৃদ্ধার দিকে।

গৌতমের মনে হলো মালার মুখখানা যেন মুহূর্তের মধ্যে চুপসে গেল। কেন ?

এক মিনিট সময় লাগল মালার নিজেকে সামলে নিতে। তার পর

মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠল, আসুন গৌতমবাবু।

গৌতম অপেক্ষা করছিল মালার আহ্বানের জন্যেই, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ চলুন।

আগে মালা ও পেছনে পেছনে গৌতম এগিয়ে চলল দরজার দিকে। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে গৌতম ইশারা করে কিছু যেন জানাবার চেষ্টা করল প্রভাসুন্দরীকে; কিন্তু বৃদ্ধার কাছ থেকে কোন পাল্টা প্রতিদান পেলো না তার। গৌতম অনুমান করল, বোধ হয় চোখে কম দেখার জন্যেই তার ইশারা বুঝতে পারলেন না বৃদ্ধা।

মালা ও গৌতম দুজনে এসে ড্রইংরুমের মধ্যে ঢুকল। তার পর সামনাসামনি দুটি সোফার ওপর বসল দুজনে।

কতক্ষণ চুপচাপ কাটল। কারো মুখে কোন কথা নেই।

অধৈর্য হয়ে গৌতম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মালা প্রশ্ন করল, কাল আপনার ফাংশনে আসবার কথা ছিল না গৌতমবাবু?

নাঃ!

কিন্তু জামাইবাবু যে বললেন একখানা শূন্য চেয়ার দেখিয়ে। আপনি কি আসবেন বলে বলেন নি?

কই না তো। আমাকে উনি অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখান করি আমি।

কেন?

সে আমার ব্যক্তিগত কারণে।

তা হলে ওই শূন্য চেয়ারটা রাখা ছিল কেন?

আমি তো তা বলতে পারি না!

সহসা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় মালার মুখখানা। মুহূর্তের মধ্যে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে তা। অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে বলে ওঠে সে, তা হলে, তা হলে···না—না, তা কি করে সম্ভব?

কি বলুন তো?

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে মালা, দিদির মৃত আত্মা তা হলে আসে নি তো!

কি বলছেন যা-তা, মানুষের আত্মা কখনও আসতে পারে লোকালয়ের মধ্যে?

হ্যাঁ, পারে। আপনি জানেন না তা হলে। আজ কদিন ধরে—

তাই বা কেন, কমাস ধরে, দিদির আত্মা কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বাড়ির চারপাশে। আমার পেছু পেছু ঘুরছে—চলাফেরার প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করছি আমি তাকে আমার পাশে পাশে। যেন সে কিছু বলতে চাইছে আমাকে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি তা। বোধ হয় জামাইবাবু দিদির আত্মাকেই আহ্বান জানিয়ে ওই চেয়ারটা শূন্য রেখেছিলেন। তাঁর আশা ছিল, দিদি এসে বলে যাবেন কিংবা তার আততায়ীকে ধরিয়ে দিয়ে যাবেন সকলের সামনে।

আপনি তা হলে জানতেন আপনার দিদি আত্মহত্যা করেন নি?

জামাইবাবুর বিশ্বাস ছিল তাই। তাঁর মুখ থেকেই শোনা আমার।

তাঁর এরকম বিশ্বাসের কারণ?

ওই বেনামী চিঠি দুটো। জামাইবাবু পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলেন চিঠির কথাগুলো—দিদিকে কেউ যে হত্যা করে বিষ খাইয়ে তা তিনি নিশ্চিত ধ্রুবসত্য বলেই ধরে নেন।

আপনার বিশ্বাস হয় নি?

না, একেবারেই না। দিদির আত্মহত্যা করবার কারণ আমি জানি বলেই বিশ্বাস করতে পারি নি তা।

বিস্ফারিত চোখে বলে ওঠে গৌতম, কি বলছেন?

বসুন একটু—আমি এখনই আসছি। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় মালা ঘর থেকে।

বোধ হয় মিনিটখানেকও পার হয় নি, ফিরে এলো মালা হাতে একখানি চিঠি নিয়ে। তার পর সেটি গৌতমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, পড়ুন!

কোঁচকানো চিঠির কাগজ একখানি। অনেক দিন আগেকার কাগজ তা দেখলেই বোঝা যায়। তবুও কোঁচকানো দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না গৌতম। দ্রুত হাতে সে সেটি খুলে ফেলল ও পড়তে লাগল:

"ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম"—

পর পর দুবার পড়ে ফেলল সেই চিঠিখানা। তার পর মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মালার অধৈর্য কণ্ঠস্বর কানে এসে

পৌছলো, পড়লেন গৌতমবাবু? কতখানি অসুখী ছিল দিদি বুঝতে পারলেন? আচ্ছা, এবার এইটে পড়ুন।

ব্লাউজের মধ্যে থেকে আর একখানি নীল রংয়ের চিঠির কাগজ বার করে ধরল মালা গৌতমের সামনে।

বিনা বাক্যব্যয়ে গৌতম সেটি নিল মালার হাত থেকে ও পড়তে শুরু করল।

"স্নেহের মালা"—

পড়লেন? দিদি যে কতখানি ভেঙে পড়েছিল এবং মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সব ব্যবস্থাও করতে আরম্ভ করেছিল—বুঝতে পারলেন তা?

ওই 'ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম' লোকটি কে জানেন?

হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে জানি—বিখ্যাত ব্যারিস্টার অজয় ভোসই হচ্ছেন দিদির ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম।

আপনি কি করে জানলেন তা?

দিদির আরো কতকগুলো চিঠি থেকে জানতে পারি আমি তা।

একথা জানান নি কেন পুলিসকে বা সুব্রতবাবুকে?

তাতে ঘরের কেলেঙ্কারিই বেরিয়ে পড়ত—মানুষটা তো ফিরত না। আর জামাইবাবুকে জানাই নি এই কারণে, বেচারী তা হলে বড্ড কষ্ট পেতেন, হয়তো কিছু একটা করে বসাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। জামাইবাবু দিদিকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

তবুও জানানো উচিত ছিল আপনার সব কথা তাঁকে ও পুলিসকে। তা হলে হয়তো সুব্রতবাবুকে এভাবে প্রাণটা দিতে হতো না।

চুপ করে থাকে মালা। সুব্রতকে সে শ্রদ্ধা করত ভালোবাসত ছোট বোনের মতই। হয়তো সেজন্যে অনুশোচনায় মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে।

এই চিঠির কথা আর কেউ জানে? গৌতম সহসা প্রশ্ন করে ওঠে।

না—একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

খুব সাবধান, কাউকে যেন বলবেন না—এমন কি, মনীশবাবুকেও না।

মালার কান দুটো লাল ওঠে মনীশের নামে। মুখখানায়ও কে যেন

আবির ঢেলে দেয়।

গৌতম সেদিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে নিয়ে বললে, আচ্ছা, তা হলে আমি চললুম—আর চিঠি দুখানাও আমার কাছে রেখে দিলুম।

উঠে দাঁড়াল মালা। তার পর গৌতমের পিছু পিছু এসে তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

॥ ষোলো ॥

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সুন্দরী প্রথমটায় গৌতমকে দেখেই। হঠাৎ তার খোঁজে একজন সুশ্রী সুন্দর যুবককে আসতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না সে।

কিন্তু সে-ভাবটা কেটে যায় গৌতমের প্রথম প্রশ্নেই, কুন্তীবাঈকে চেনো তুমি?

আন্দাজ করে সুন্দরী, গৌতম নিশ্চয়ই পুলিসের লোক। তাই সে ভেতরে ভেতর তৈরী হয়ে নেয় ও গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে ঘাড়টা মৃদুভাবে নাড়ে।

কদ্দিন কাজ করেছিলে তুমি তাঁর কাছে?

দিন পনেরো হুজুর।

কত দিন আগে?

এক বছর পার হয়ে গেছে হুজুর।

এই এক বছরের মধ্যে আর কোথায় কোথায় চাকরি করেছ তুমি?

মাত্র দু জায়গায়—পদ্মপুকুরে বীরেন দত্তর বাড়িতে, আর বালিগঞ্জে অমর ঘোষের বাড়িতে।

আমায় চেনো তুমি? সহসা জিজ্ঞাসা করে গৌতম।

ঘাড় নেড়ে বলে সুন্দরী, হ্যাঁ হুজুর—পুলিসের লোক।

তা হলে বুঝতে [illegible] দেখছি। যাক্, শোন সুন্দরী, আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, যদি মনে হয় আমায় যে মিথ্যা বলছ, তা হলে

সঙ্গে সঙ্গে ফাটকে পুরে দেব।

আধ হাত জিভ বার করে কান ছুটো নিজের হাতে মুলে বজ্জাৎ সভয় প্রতিবাদের সুরে বললে সুন্দরী, না হুজুর, সব-সব সত্যি বলব, আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

কুন্তীবাঈ, মানে, তোমার মনিব মারা গেছেন জানো তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

কি করে জানলে?

মানদা বলছিল।

মানদা?

এখনও সে কাজ করছে ওখানে—ওঁদের পুরনো ঝি।

তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

আমরা এক দেশের লোক হুজুর।

কোথায় দেশ তোমার?

হাওড়া জেলার পলাশপুরে।

সুব্রতবাবু মারা গেছেন জানো?

আঁতকে ওঠে সুন্দরী, বাবু—বাবু মারা গেছেন?

হ্যাঁ, পরশুদিন।

কি করে মারা গেলেন হুজুর? আহা, বড্ড ভালো লোক ছিলেন তিনি।

কেউ খুন করেছে তাঁকে।

খুন করেছে? সুন্দরীর চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে, আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করে, কি করে খুন করল বাবুকে?

জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে।

বাবুকে বিষ দিয়ে খুন করেছে! এ বিশ্বাস হয় না হুজুর, বাবু আমাদের দেবতার মত লোক ছিলেন—তাঁর কোন শত্রু থাকতে পারে না।

কেন, কিসে বুঝলে?

তেনার মত লোক আমি আমার জীবনে দেখি নি—যেমন কথা তেমনই ব্যবহার। হ্যাঁ, যদি বৌদিমণি হতেন, বিশ্বাস করতুম আমি।

কেন, বৌদিমণি লোক কি খুব খারাপ ছিলেন?

হ্যাঁ হুজুর, বড় দুর্মুখ ছিলেন।

পুলিসের খাতায় কিন্তু তোমার নাম উঠেছে—তুমি নাকি তাঁকে শাসিয়ে আস চাকরি ছাড়ার সময়ে?

হুজুর, আমার কোন দোষ ছিল না। বৌদিমণির কাছে অনেক লোক আসত। একদিন একজন লোক বৌদিমণিকে খুব শাসাচ্ছিল—আমি সেটা শুনে ফেলি আড়াল থেকে, তার পর মানদা ও ভরতের কাছে গল্প করি। ওরা আবার সেটা লাগিয়ে দেয় বৌদিমণির কাছে। বৌদিমণি তাতে চটে গিয়ে আমায় যাচ্ছেতাই করে বকেন ও তাড়িয়ে দেন। তাইতে আমি রাগ করে দু-এক কথা বলে আসি বৌদিমণির মুখের ওপর।...

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ হুজুর, দিব্যি গেলে বলছি।

থাক্ থাক্, আর দিব্যি গালতে হবে না।...সে লোকটির নাম কি মনে আছে?

সুন্দরী এক মুহূর্ত ভাবে যেন কিছু, তার পর মুখটা তুলে বলে, না হুজুর, মনে পড়ছে না।

চেষ্টা করে দেখ সুন্দরী। তোমার ভালো-মন্দ নির্ভর করছে সেটার ওপর। যদি নামটা বলতে না পার, তোমার পক্ষেই খারাপ হবে তা।

হুজুর, নামটা পেটে আসছে কিন্তু মুখে আসছে না। একটু অপেক্ষা করুন, বলছি।

সুন্দরী আরো মুহূর্তকয়েক ভাবে চোখ দুটো বুজে। কিন্তু ওদিকে অধৈর্য হয়ে ওঠে গৌতম। সে বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলতে যাচ্ছিল কিছু, তার আগেই হাসি-হাসি মুখে বললে সুন্দরী, হুজুর, পুরো নামটা মনে আসছে না—লাইড়ী না কি যেন অদ্ভুত একটা পদবী ছিল লোকটার নামের পাশে।

মনীশ লাহাড়ী?

হ্যাঁ হুজুর, ঠিক ঠিক। ওই নামই ছিল লোকটার।

কি বলে শাসাচ্ছিল লোকটা তোমার বৌদিমণিকে?

লোকটা বলছিল তাঁকে, ফের যদি তুমি ওই নামটা উচ্চারণ করো, তোমার ওই সুন্দর মুখ আর সুন্দর থাকবে না, চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে

যাবে তা। খুব সাবধান, যদি আর কারো কানে গিয়ে পৌঁছয় নামটা, তা হলে তোমার বিপদ ঘনিয়ে উঠবে—খুন হয়ে যাবে তুমি।

কেন, কি নাম ছিল সেটা ?

তা শুনি নি হুজুর। ওইটুকু শোনার পরই বুকটা গুরগুর করে ওঠে, ভয়ে আমি পালিয়ে আসি।

তোমার বৌদিমণি কি করলেন তার পর ?

তা জানি না হুজুর, আর আমি শোনবার জন্যে দাঁড়াই নি।

তুমি কি লোকটাকে খুনী বলে সন্দেহ করো ?

তা বলতে পারব না হুজুর। তবে লোকটা যে গুণ্ডাগুণ্ডা গোছের ছিল তা তাকে দেখলে আপনিও স্বীকার পাবেন।

তুমি লেখাপড়া জানো কিছু ?

না হুজুর, মুখ্যু মেয়েছেলে আমরা—লেখাপড়া জানলে পরের দরজায় চাকরি করতে যাব কেন ?

তুমি কি কাউকে দিয়ে দুখানা চিটি লিখিয়ে তোমার বৌদিমণির মৃত্যুর পর বাবুর কাছে পাঠাও ?

কিসের চিঠি হুজুর ?

তুমি লেখো তোমার বাবুকে, বৌদিমণি আত্মহত্যা করেন নি, কোন লোক তাঁকে খুন করেছে।

না হুজুর, আমি কি জন্যে চিঠি লিখতে যাব—আমি ওসবের কিছুই জানি না।

ঠিক বলছ তো ?

হ্যাঁ হুজুর।

যাক্ শোন, আমার এখানে আসার কথা যেন আবার কাউকে গল্প করো না, তাতে তোমারই ক্ষতি হবে, তোমায় বাঁচাতে আর পারব না। আর তুমি আমায় যা বললে, সেটা আমি যাচাই করে নেব মনীশ লাহাড়ীর কাছে গিয়ে, যদি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়, চালান করে দেব সোজা তোমায়।

হুজুর, একটা কথা বলব ?

বলো।

আমার নাম বলবেন না ওই লোকটার কাছে।

কেন ?

ওরা সব পারে হুজুর, আমাকেই হয়তো খুন করে বসবে।

না-না, তুমি ভয় পেয়ো না—তোমার নাম আমি করব না তার কাছে।

হঠাৎ সুন্দরী এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসে। গৌতমের পায়ের ওপর পড়ে ঢিপ করে এক প্রণাম করে তাকে।

॥ সতেরো ॥

বাড়ির সামনে এসে বিস্মিত হয়ে পড়ে গৌতম। তার দরজায় অপরিচিত মোটর।

কাছে গিয়েও সোফার বা মোটরটিকে চিনতে পারে না তবু। তাই একটু বিস্মিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করে অপরিচিত মোটরটির সোফারকে, কোথা থেকে আসছ তুমি ?

ধনী মালিকের স্বাক্ষর সর্বাঙ্গে সোফারটির। খুব মূল্যবান না হলেও মাঝামাঝি দামের একটি সাদা স্যুট পরনে তার। মাথায় টুপি। হাতে আংটি তিনটি। সোনার ব্যাণ্ডওয়ালা ঘড়ি কব্জিতে শোভা পাচ্ছে। স্মিতহাস্যে সোফার নিবেদন করলে, রাসবিহারী এভিনিউ থেকে আসছি—মা ভেতরে গেছেন।

বাঙালী সোফার। তাই বুঝি এত সাজসজ্জা অঙ্গে। বিস্মিত গৌতম ভাবে মনে মনে।

মা কে ? কত বয়স তাঁর ? তার সঙ্গে কি দরকার মায়ের ? গৌতম নিজেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও কোনও সদুত্তর পায় না।

কিন্তু সোফারকে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না—সেটা অনুভব করে গৌতম। তাই আরো একবার মোটরটির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে ও সোফারকে আড়চোখে দেখে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে হলো না তাকে। দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল ভৃত্য নকুড়। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে সে, এত দেরি

করলে? কখন থেকে একজন মেয়েছেলে বসে আছে তোমার জন্যে!

কে রে নকুড়দা, চিনিস তাঁকে?

কি করে চিনব—কত লোকই তো রোজ আসছে-যাচ্ছে তোমার কাছে, তাদের সকলকে চিনি কি?

তা বটে। আপনমনেই বলে গৌতম একটু হাসে।...আচ্ছা, তুই যা নকুড়দা, আমি দেখছি। হ্যাঁ, ভালো কথা, দু গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস নিয়ে আয়।

গৌতম আর দাঁড়ায় না। দ্রুত ওঠে সিঁড়ি বেয়ে। তার পর ড্রইং-রুমের দিকে পা বাড়ায়।

কিন্তু আরো বিস্ময় জমা ছিল গৌতমের জন্যে। সেই বিস্ময়ের সামনা-সামনি হয়ে এবার যেন ভেঙে পড়বার মত উপক্রম হয় তার। গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, নড়বার-চড়বার শক্তিও কে যেন হরণ করে নেয়।

এই অপূর্ব সুন্দরী লাস্যময়ী তরুণী কে? তার ঘরে এত রাত্রে মনোহর সাজে সজ্জিতা এই রূপবতী কে? একে তো সে কই কোন দিন দেখে নি!

এই মহিলাই কি মা? ইনিই কি অপেক্ষা করছেন তার জন্যে? কিন্তু এঁকে তো চেনে না গৌতম—তবে ইনি কে?

তরুণী ঘুরে দাঁড়াল।

আবারও স্তব্ধ হয়ে যায় গৌতম বিস্ময়ে। এ মুখ যে চেনা তার!

কে? কে? কে?

কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারে না গৌতম। স্মৃতির অতলে হাতড়ে হাতড়ে শত চেষ্টা করেও কিছুতেই আর তরুণীর পরিচয় স্মরণে আনতে পারে না সে।

বীণানন্দিত কণ্ঠে তরুণী প্রশ্ন করে, আপনি কি গৌতমবাবু?

হ্যাঁ, বলুন! বিস্ময়ের ঘোর তখনও গৌতমের কণ্ঠে।

সুব্রত রায়ের মৃত্যু-রহস্যের কেসটা আপনারই হাতে?

গৌতমের বিস্ময় আর যেন বাধ মানে না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে ওঠে, আপনাকে—আপনার পরিচয়টা পেতে পারি?

নিশ্চয়ই, তবে আমাকে চিনবেন না আপনি—আমার নাম সুনন্দা

ব্যানার্জি।

আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

তা তো বলতে পারছি না। তবে বোধ হয় কোন এমেচার পার্টিতে অভিনয় করতে দেখে থাকবেন।

নাঃ, চিন্তিত কণ্ঠে বলে ওঠে গৌতম, আর কোথাও……

নির্বাক সুনন্দা। উত্তর দেবার মত কিছু ছিলও না বোধ হয় তার।

সুব্রতবাবুকে আপনি চিনতেন?

না।

তবে তাঁর মৃত্যু-রহস্যের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ…মানে, সে সম্বন্ধে খোঁজ করতে আসার হেতু?

ভদ্রলোকের আকস্মিক মৃত্যুর খবরটা কাগজে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছি আপনার কাছে।

কেন বলুন তো?

আমার কিছু বলবার আছে, মানে, আমি—আমার কাছে উনি এসেছিলেন, একটা পার্টিতে একটি মেয়ের সাজ পরে হাজির হবার জন্যে—সেই কথাগুলোই জানাতে এসেছি আপনাকে।

কৌতূহলী হয়ে ওঠে গৌতম। ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন!

সুব্রতবাবু আমার খোঁজ পান কোথা থেকে জানি না, তবে উনি যে ফটোটা নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে—তার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে অনেকখানি। উনি বলেন, আমাকে সেই ফটোর মেয়েটির মত হুবহু সাজগোজ করে একটি ফাংশনে হাজির হতে হবে—ফাংশনটি কাল অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে গৌতম, সেই ফটোর মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিলেন আপনি?

হ্যাঁ।

কে সে?

কুন্তীবাঈ।

উনি কিছু বলেন—কেন কুন্তীবাঈয়ের সাজে আপনাকে সে-ফাংশনে হাজির হতে হবে?

হ্যাঁ, বলেন। বন্ধুদের সঙ্গে তিনি বাজী ধরেছেন, কুন্তীবাঈয়ের চেহারার মত হুবহু একজনকে তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং তাকে তিনি হাজির করতেও পারেন। হাজার টাকার বাজী। সুব্রতবাবু বলেন, আমাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু একবার মাত্র হাজির হতে হবে—তা হলেই উনি বাজীর অর্ধেক টাকা ও আমার পারিশ্রমিক বাবদ একশটা টাকা দেবেন আমায়।

গৌতমের কাছে এবার একটু একটু করে রহস্যের গ্রন্থিগুলো খুলে যেতে থাকে। এমন কি, সুনন্দাকে কেন পরিচিত মনে হয়েছিল ক্ষণপূর্বে, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। কুন্তীবাঈয়ের মত দেখতে বলেই তাকে অত চেনা-চেনা বোধ হয়েছিল। সেও কুন্তীবাঈয়ের ফটোটা দেখেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই।

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে গৌতম জিজ্ঞাসা করল, তার পর?

সুব্রতবাবু কাল দুপুরে আরো একবার আসেন আমার বাড়িতে ও আমায় অগ্রিম বাবদ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যান। সেই সঙ্গে ফটোর সাজের একপ্রস্থ কাপড়-জামা ও ফটোর একটা কপি দিয়ে যান। আরো বলেন, ওই ফটোর মত হুবহু মেক-আপ নিয়ে তবে যেন আমি হাজির হই শিশমহলে।

আর কিছু বলেন?

হ্যাঁ, সুব্রতবাবু আমাকে ঠিক নটার সময়ে যাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কারণ ওই সময়েই নাকি সকলে খেতে বসবেন—আর ডিনার-টেবিলে তিনি আমাকে নিয়ে একটা রহস্যের তুফান তুলবেন।

আপনি রাজী হয়েছিলেন তাঁর সব সর্তে?

হ্যাঁ। আপত্তি করবার কোন হেতু খুঁজে পাই নি। কারণ আমি অভিনেত্রী। অভিনয় করাই আমার পেশা। আর এই সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে যদি মোটামুটি কিছু রোজগার হয়ে যায়—এই আশায় আপত্তি করি নি একেবারে।

তা হলে আপনি আপনার কথা রাখলেন না কেন শেষ পর্যন্ত?

একটা অদ্ভুত কারণে। হঠাৎ সন্ধ্যে সাতটার সময়ে ফোন এলো একটা। ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠতে ছুটে গেলুম ও রিসিভার তুলে নিলুম। তারের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো একটা

মোটা ভারী গলার স্বর, আমি সুব্রত রায় কথা বলছি, আজ আপনার সঙ্গে যে এনগেজমেণ্ট ছিল, সেটার জন্যে আর আসতে হবে না, অন্য আর-এক দিনে সে অনুষ্ঠানটা হবে। পরে আর-এক দিন আপনাকে জানিয়ে দেব তা।

সুব্রতবাবু কথা বললেন? আপনি তাঁর গলার স্বর চিনতে পারলেন?

আমি তাঁর গলার স্বর টেলিফোনে কোনদিন শুনি নি। তা ছাড়া ভদ্রলোক এমন ভারী গলায় কথা বলছিলেন যে বুঝতেই পারলুম না ঠিক তাঁর গলার স্বর কি না। তবে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, হঠাৎ আপনার গলা ধরল কিসে?

কি বললেন তিনি?

উত্তরে তিনি জানালেন, সেজন্যেই ফাংশনটা পেছিয়ে দিলেন। হঠাৎ জ্বরের মতন হয়ে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ায় উপায়ান্তর না দেখে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হলো তাঁকে।

আপনি কি করলেন তার পর?

কিছুই করবার ছিল না। সবে মেক-আপ শুরু করেছিলুম, বাধ্য হয়ে সে-কাজ বন্ধ রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

সুব্রতবাবুর খবরটা—মানে, ওঁর মৃত্যু-সংবাদটা কখন জানতে পারলেন?

আজ। তাও বিকেলের দিকে। খবরের কাগজেই দেখলুম আপনার নাম। সেজন্যে সোজাসুজি আপনার কাছেই ছুটে এলুম।

ভালো করেছেন। আপনার কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পেলুম, আর তাতে এই রহস্যের ওপরে বেশ কিছুটা আলোকপাতও হলো। বহু ধন্যবাদ আপনাকে।

আচ্ছা, তা হলে চলি আমি আজ?

যাবেন? বেশ। কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন কটা দিন—কে জানে হয়তো আপনার ওপর নজর আছে…এখানে এলেন—সেজন্যে… যাক্, সাবধানে থাকবেন, তা হলেই হবে, আপনার আর কি ক্ষতি করবে?

ভয়ে মুখখানা সিঁটকে উঠল সুনন্দার। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কি ভেবে আর বলল না, শুধু হাত দুটো তুলে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ধীর শান্ত পদে।

॥ আঠারো ॥

পরের দিন অজয় ভোস লালবাজারের গেটের মধ্যে প্রবেশ করছে যখন, তখন যদি কোন পরিচিত লোকের সামনাসামনি পড়ে যেত, তা হলে বোধ হয় চমকে না উঠে পারত না সে। মানুষ এক রাত্রির ব্যবধানে যে এতখানি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে তা চাক্ষুষ না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন।

মাত্র এক রাত্রি। কিন্তু এই এক রাত্রির মধ্যে অজয় ভোসের চেহারায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক রকম শুকিয়ে উঠেছে। ভালো করে না খাওয়া-দাওয়ার জন্যে চেহারাটাও শুকনো দেখাচ্ছে আর যেন কিছুটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। এক নজরে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মাত্র এক রাত্রেই বয়সটা তার বেশ কয়েক বছর এগিয়ে গিয়েছে সামনের দিকে।

কমিশনারের ঘরে গৌতম অপেক্ষা করছিল। অজয়ের নাম-লেখা কার্ড নিয়ে সার্জেন্ট ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল সে।

আহ্বান পেয়ে অজয়ের ঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম বিস্মিত না হয়ে পারল না। এ কী আমূল পরিবর্তন? এতখানি বদলে যেতে পারে মানুষ ভাবনা-চিন্তায় এক রাত্রির মধ্যে? নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না সে।

কমিশনারের অনুরোধে অজয় বসল একখানি চেয়ারের ওপর। তার হাত কাঁপছে, ঠোঁট কাপছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

গৌতমই প্রথম কথা বললে, আপনার কাছ থেকে আমরা একটা স্টেটমেণ্ট নেব মিঃ ভোস। আমরা যে প্রশ্ন করব ও আপনি তার যা উত্তর দেবেন—সেটারই ওপর দস্তখত দিয়ে যাবেন।

আ—আমি কি বলব, যা বলবার ছিল, সবই তো বলেছি আপনাকে কাল। অতি কষ্টে কোন রকমে তোৎলাতে তোৎলাতে কথা কটা বলে অজয়।

এই চিঠিটা দেখুন তো অজয়বাবু, হাতের লেখাটা চিনতে পারেন?

এ্যাঁ…হ্যাঁ, কুন্তীর হাতের লেখা।

তা হলে উনি যেসব কথাগুলো লিখেছেন—স্বীকার করছেন তা ?

না—না, আমি কি জানি, আমাকে……

চিঠিতে 'ব্যাঘ্ররাজ প্রিয়তম' সম্বোধন করা ব্যক্তি আপনি নন ?

নীরব অজয়।

বলুন অজয়বাবু, চুপ করে থাকবেন না।

হ্যাঁ। বলুন কি জানতে চান ?

এই চিঠি প্রমাণ করে দিচ্ছে, আপনি মৃত কুন্তীবাঈয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছিলেন, আর তার জন্যে আপনি এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন তাঁকে…

তাতে কি হয়েছে ? তার দ্বারা কি বোঝা যায় ?

আস্তে অজয়বাবু, আমি সেই পয়েণ্টেই আসছি। আপনি একজন নামকরা ব্যারিস্টার, কিসে কি হয় তা বেশ ভালোভাবেই জানেন।… আপনি ছেড়ে যেতে চাইলেও, কুন্তীবাঈ ছাড়তে চান নি আপনাকে, আর সেজন্যে তাঁর মুখ বন্ধ করবার জন্যে আপনি যে কোন হীনপন্থা গ্রহণ করেন নি তারই বা প্রমাণ কি ?

বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই কিছু জানি না তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। আমার ধারণা ছিল এবং এখনও আছে—এটা পরিষ্কার আত্মহত্যার কেস বলে।

বেশ, আপনার কথাটাই যদি সত্যি বলে ধরা যায়, তা হলে সুব্রতবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কি বলবেন ?

নীরব অজয়।

আমি বলছি, বলে চলে গৌতম, কুন্তীবাঈ নিহত হন। পরিষ্কার মার্ডার কেস। বিষ দিয়ে হত্যা করে কেউ তাঁকে। প্রথমে সুব্রতবাবু অতটা আন্দাজ করতে পারেন নি। তিনিও জানতেন এটাকে সুইসাইড কেস বলে। কিন্তু যখন সন্দেহ জাগল মনে, তিনি উঠে পড়ে লাগলেন সম্ভাব্য আততায়ীকে খুঁজে বার করতে। সফল হয়ে এসেছিলেন কি না শেষ পর্যন্ত সেটা তিনিই জানতেন, তবে তিনি একটি পার্টির ব্যবস্থা করেন এবং এমন আশা ব্যক্ত করেন যার দ্বারা মনে হয়, পরশু রাত্তিরেই তিনি তাঁর স্ত্রীর আততায়ীকে ধরে ফেলতে সক্ষম হতেন। কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না তিনি। কুন্তীবাঈয়ের আততায়ী তার আগেই শেষ করে দিল

তাঁকে সেই একই পদ্ধতিতে—যে পদ্ধতিতে সে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। বেচারা ভয় পেয়ে গেল, যদি সুব্রত জানতে পেরে গিয়ে থাকে, তা হলে আর তার রক্ষা নেই—সেজন্যে সে সুযোগ আর সে দিল না সুব্রতবাবুকে।

চুপ করল গৌতম। নিস্তব্ধ ঘর। কারো মুখে কথা নেই।

একটু পরে গৌতমই শুরু করল আবার, তা হলে বুঝতে পারছেন, কুন্তীবাঈ ও সুব্রতবাবুর আততায়ী একই ব্যক্তি? এবার বলুন, আপনাকে যদি অভিযুক্ত করি সেই অপরাধে, আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন তা?

নিশ্চয়ই পারি। একটা আজগুবি অবাস্তব কথা মেনে নিতে পারি না আমি নিশ্চয়ই।

প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও?

কি প্রমাণ?

আপনার বংশ-গরিমা, পেশা, সমাজে প্রতিপত্তি—এসব রক্ষা করবার জন্যেই আপনি এই হীন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এটা তো আর মিথ্যে নয়?

সম্পূর্ণ মিথ্যা আর অলীক। আপনাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যা কিছু উদ্ভূত হবে তাই যদি সত্যি বলে মেনে নিতে হয় তা হলে আমাদের বাঁচবার আর উপায় থাকে না।

কুন্তীবাঈ যেভাবে আপনাকে চেপে ধরেছিলেন, অর্থাৎ নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েছিলেন তাঁকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে নীড় রচনা করবার জন্যে, সেকথা আপনি অস্বীকার করেন?

না, তা করি না। তবে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে সত্যিসত্যিই তাকে নিয়ে আমায় পালিয়ে যেতে হতো লোকচক্ষুর আড়ালে। এমনও হতে পারত, আমি তাকে বুঝিয়ে এখানেই থাকতে রাজী করতুম। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের উভয়ের তরফে এমন সাংঘাতিক কিছু অবস্থা ঘটে নি—যার জন্যে তাকে হত্যা করে আমাকে সেই অবস্থা থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।

তা হলে আপনি নিজেকে নির্দোষ বলে অভিহিত করছেন?

কোন দোষই করি নি—তার আবার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার

চেষ্টা।

মিসেস ভোস ?

কী হয়েছে ?

তিনি করেন নি তো এ কাজ ?

ছি ছি, আপনাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল গৌতমবাবু ?

এখনও পায় নি, তবে পেতেও আর বিলম্ব নেই বলে মনে হয়। যেভাবে অপরাধের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে আমাদের সমাজের বুকে, তাতে নিজেদের আর মনুষ্য-পদবাচ্য বলে স্বীকার করতে আপনা হতে মাথা হেঁট হয়ে আসে।

আপনাদের অক্ষমতার দরুণই এরকম ঘটছে। যেভাবে আপনারা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে চলেছেন, তাতেই সমাজের ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে আসছে—একথা স্বীকার করুন আর নাই করুন, মানতেই হবে।

যাক্, ওসব তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার আলোচনায় কোন লাভ নেই, এখন বর্তমান ব্যাপাটা নিয়েই কথা বলুন।

আমার আর কিছু বলার নেই। আপনার অভিযোগ আর দোষা-যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, শুধু এইটুকুই জানিয়ে দিলুম। দয়া করে এবার ছেড়ে দিন আমায়, জরুরী কেস আছে একটা—সেটায় এ্যাটেণ্ড করতে হবে।

বেশ তাই 'নোট' করে নিলুম। কিন্তু পরে যদি অন্যরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন আপনাদের অপরাধটা আরও সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াবে, খেয়াল রাখবেন। যাক্, এই স্টেটমেণ্টটায় সই করে দিন।

গৌতম আগাগোড়া লিখে যাচ্ছিল তাদের কথোপকথনের অংশটুকু। এবার সেই কাগজগুলি বাড়িয়ে দিল অজয় ভোসের দিকে—সেগুলি পড়ে তার ওপর সই দেবার জন্যে।

অজয় সেগুলি পড়ল আরও একবার, তার পর সই করে দিল প্রত্যেকটি সীটের ওপর। সই হয়ে যাবার পর আর দাঁড়াল না সে মুহূর্তের জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অজয়ের নিষ্ক্রামণের সঙ্গে সঙ্গে গৌতম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কমিশনারের মুখের দিকে ও জিজ্ঞাসা করল, কি বুঝলেন ?

মনে হয় নির্দোষী। না হলে এত জোর দিয়ে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না।

কিন্তু তা হলে করল কে একাজ?

দেখা যাক্। তবে অজয় ভোসের ওপর নজর রাখা যেন ছেড়ো না।

না স্যার। আমার কিন্তু এখনও পুরোপুরি সন্দেহ আছে ভদ্রলোকের ওপর।

ভালো কথা, তুমি মনীশ লাহাড়ীর কাছে গিয়েছিলে?

এখনও যেতে পারি নি—এখান থেকে বেরিয়ে এবার যাব।

আজ সকালেই যাওয়া উচিত ছিল তোমার তার কাছে। বিশেষ করে, সুন্দরীর স্টেটমেণ্টটা যদি কারেক্ট হয়, তা হলে তাকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

বুঝেছি স্যার। মনীশ লাহাড়ীর সঙ্গে আমার ইণ্টারভিউয়ের খবর আপনাকে আমি ঠিক সময়ে জানিয়ে দেব।

ভেরী গুড।

॥ উনিশ ॥

মনীশ লাহাড়ী মিনিটখানেক কার্ডটার ওপর চেয়ে থেকে ভৃত্য নিতাইকে আদেশ দিলে, আচ্ছা, বসা গে যা বাবুকে ড্রইংরুমে—না-না, গোলঘরে।

বাবু—গোলঘরে? নিতাই সন্দেহান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ওঠে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাস্ না নাকি? ঈষৎ রুক্ষস্বরে ধমকে ওঠে মনীশ নিতাইকে।

চোখের নিমেষে নিতাই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মিনিট দুই আরো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল মনীশ, তার পর ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে এগুলো বহির্মহলের দিকে।

নির্বিকার শান্ত-সমাহিত চিত্তে গৌতম বসে বসে সিগারেট টানছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মনীশ চটিজুতোটা ফটর ফটর করতে করতে।

আসুন মনীশবাবু; অসময়ে এসে আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করলুম।

ছি ছি, ওকথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না আপনাদের তুলনায় আমাদের আবার কাজ!

বেশি সময় নেব না আমি—মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন করেই………

তার জন্যে কি হয়েছে…জিজ্ঞাসা করুন কি জানতে চান! ভালো কথা, আপনি সেদিন রাত্রে সুব্রতবাবুর পার্টিতে এলেন না কেন? আপনার জন্যে উনি শেষ পর্যন্ত আকুলি-বিকুলি করেন।

আপনার ধারণা ভুল মনীশবাবু। ওই শূন্য চেয়ারটা আমার জন্যে রাখা ছিল না।

তাই নাকি? কিন্তু সুব্রতবাবু……

সুব্রতবাবু এমন কথা বলেন নি যে আমি গিয়ে ওই চেয়ারটায় বসব, মনীশকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠে গৌতম, ওটা রাখা ছিল অন্য আর-একজনের জন্যে—যার আসন দখল করবার কথা ছিল আলো জ্বলে ওটবার অব্যবহিত পরেই।

কে সে?

সুনন্দা ব্যানার্জি বলে একটি মেয়ে।

সুনন্দা ব্যানার্জি! কই এ নাম তো শুনি নি কখনও এর আগে?

সখের দলের অভিনেত্রী—একরকম অখ্যাতই বলতে পারেন, কিন্তু কুন্তীবাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

মনীশ শিস্ দিয়ে উঠল, বললে, এবার বুঝতে পারছি আমি একটু একটু করে।

মেয়েটিকে কুন্তীবাঈয়ের একটি ফটো দেওয়া হয়েছিল, যাতে সে হুবহু তার মত মেক-আপ নিতে পারে এবং কুন্তীবাঈয়ের একটি ড্রেসও দেওয়া হয়েছিল তাকে পরবার জন্যে—ঠিক যে ড্রেস পরে কুন্তীবাঈ সেদিন রাত্রে মারা যায়।

তা হলে এই হচ্ছে সুব্রতবাবুর প্ল্যান!… আলো জ্বলে উঠলে সকলে ভয় পেয়ে যাবে—কুন্তীর প্রেতাত্মা প্রতিহিংসা নিতে ফিরে এসেছে ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ হত্যাকারী কবুল করে বসবে তার দোষ তার অপরাধ! নাঃ, ভদ্রলোক নেহাত ছেলেমানুষ ছিলেন, নাহলে এরকম প্ল্যানের কথা ভাবতে পারেন? যথার্থ হত্যাকারীরা, আর যাই করুক, এত সহজে নতি স্বীকার করে না।

তা তো আপনাকে দিয়েই দেখতে পাচ্ছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মনীশের, তার মানে ?

মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন—আপনি কি কুন্তীবাঈকে ভয় দেখান নি এক দিন যে তিনি যদি আপনার কথা না শোনেন, তা হলে তাঁর সুন্দর মুখখানা বিকৃত হয়ে যেতে পারে, এমন কি মাথার খুলি পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে ?

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় মনীশ লাহাড়ীর মুখমণ্ডল। আষাঢ়ে মেঘের মত থমথমে হয়ে ওঠে তা।

মুহূর্ত কয়েক কি যেন ভাবল সে গভীরভাবে, তার পর মুখখানা তুলে অচঞ্চল দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি কতখানি জানেন ঠিক জানি না, শুরু থেকেই আরম্ভ করা যাক্।

আবারও মুহূর্ত খানেকের স্তব্ধতা। তার পর শুরু করল মনীশ তার কাহিনী।

বাবা মারা যাবার পর অগাধ সম্পত্তি এসে পড়ল হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুও জুটে গেল এক পাল। কোথা থেকে এলো তা বলতে পারব না, কিন্তু তার মধ্যে ভালো মন্দ দুই-ই ছিল। তাদেরই পরামর্শে ব্যবসায় নামলুম। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারলুম না—হাজার পঞ্চাশেক টাকা লোকসান দিয়ে ঘরে ফিরে এলুম।

বেশি দিন বসতে হলো না। আবারও জড়িয়ে ফেললুম নিজেকে আর এক ঝঞ্ঝাটে। প্রথমে ব্যাপারটার সিরিয়াসনেস বুঝতে পারি নি, কিন্তু যখন বুঝলুম, তখন আর ফেরার পথ নেই। তখন আমি এমন এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি—যাদের দ্বারা কোনরকম নীচ ও নোংরা কাজ করা কিছুমাত্র অধর্মীয় ও অন্যায়মূলক ছিল না। তাদের মটো ছিল, কাজ উদ্ধার করবার জন্যে প্রয়োজন হলে মানুষ খুন করবে, নারী লাঞ্ছনা করবে, শিশুহত্যা অবধি করতে পেছিয়ে আসবে না।

প্রথমে বুঝতে পারি নি, কিন্তু যেদিন যে-মুহূর্তে বুঝতে পারলুম তা, সেদিন থেকে ফাঁক খুঁজতে লাগলুম দল ছেড়ে আসবার জন্যে। কিন্তু বড় শক্ত কাজ। আমার চেয়েও আমার টাকার ওপরে ওদের নজর বেশি দেখলুম। তখন বাধ্য হয়ে নাম পাল্টালুম। আমার অরিজিনাল নাম

মণি বাগচী, কিন্তু সে নাম পাল্‌টে আমি নিজের নতুন নামকরণ করলুম মনীশ লাহাড়ী। তার জন্তে চেহারায়ও ঘটালুম কিছুটা তফাত। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলুম। স্বদেশের চেয়ে বিদেশেই কাটতে লাগল আমার দিন। বোধ হয় বছর তিনেক সবসুদ্ধ এই ভাবে হন্তের মত বাইরে বাইরে ঘুরে বেরিয়েছি।...

আপনি বোধ হয় জেলও খেটেছেন? প্রশ্ন করল গৌতম তার কথার মাঝখানেই।

হ্যাঁ। ওদের পাল্লায় পড়ে জেলেও যেতে হয়েছিল আমায় একবার। সত্যি কথা বলতে কি, তার পর থেকেই আমি সতর্ক হয়ে উঠি এবং চেষ্টা করি দলত্যাগ করবার।

এখন কিরকম পজিসন আপনার?

মোটামুটি আশাপ্রদ। ওরা আমাকে খুঁজে বার করতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। যদি পারে, তা হলে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। তবে মনে হয়, আর বোধ হয় পারবে না। কারণ আমার জমিদারী ও অন্য সব জায়গায় আমি মৃত বলে ঘোষিত হয়েছি।

আবারও বাধা দিয়ে বলে ওঠে গৌতম, তা হলে আপনার জমিদারীর টাকাপত্তর আপনি পান কি করে?

বাবার এক এটর্নী-বন্ধু ছিলেন—তাঁরই ব্যবস্থায় এটা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরই নির্দেশানুযায়ী সমস্ত সম্পত্তি আমি দানপত্র দ্বারা মনীশ লাহাড়ীকে দান করি এবং বর্তমানে সে-ই এখন সে-সম্পত্তির মালিক। মনি বাগচী দানপত্র রচনা করার পর আত্মহত্যা করে পরপারে চলে গিয়েছে। অবশ্য এই ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহের সৃষ্টি যাতে না হয় তার জন্তে তুজন লোক আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন—একজন আমার বাবার এটর্নী-বন্ধু বিশ্বনাথবাবু, আর একজন হরিহর দাস—আমাদের বিশ্বস্ত নায়েব। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাকে ওরা মৃত বলেই ধরে নিয়েছে।

আচ্ছা, কুন্তীবাঈ আপনার পুরনো নামটা জানতে পারলেন কি করে?

কুন্তীর এক পিসতুতো ভাই আছে—নাম তার রতন গুপ্ত। লোকটা এক নম্বরের স্কাউণ্ড্রেল। বহুবার জেল খেটেছে সে। আমি যে-সময়ে

জেলে যাই, সে-সময়ে সে আমাকে দেখে সেখানে ও আমার নামটা স্মরণে রাখে। তার পর আমাকে কুন্তীর কাছে যাতায়াত করতে দেখে তাকেই বলে দেয় সে সেকথা। কুন্তীও ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝে সেই নামটা নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দেয় দেখে চঞ্চল হয়ে উঠি আমি ও তাকে ওইভাবে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করি।

বুঝলুম এবার সব ব্যাপারটা, হাসতে হাসতে বললে গৌতম, সমস্ত পয়েণ্টগুলোই এবারে ক্লিয়ার হয়ে গেল আমার কাছে। তা হলে মণি বাগচী এখন মনীশ লাহাড়ীতে পরিণত হয়েছে। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রতন গুপ্ত লোকটা কেমন?

কি অর্থে জিজ্ঞাসা করছেন?

লোকটির সঙ্গে আপনার তো বেশ আলাপ-সালাপ হয়েছিল বললেন, তাতে……

মাপ করবেন, গৌতমকে বাধা দিয়ে বলে উঠল মনীশ, ও-রকম স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে আলাপ করতে বা বন্ধুত্ব পাতানোর কথা কল্পনা করতেও ঘৃণা বোধ করি আমি। একজন সাধারণ লোফার ছাড়া কিছু নয় সে।

তার সঙ্গে জেলে আপনার আলাপ হয় নি?

একেবারেই না।

অথচ সে আপনাকে ভালো করে চেনে।

সেটা আমিও তাকে যেমন চিনি—সেও আমাকে তেমনই চেনে।

তবুও আপনার কি মনে হয়—লোকটাকে কি হত্যাকারী বলে ধারণা হয়?

ঠিক তা বলতে পারব না, তবে তার পাস্ট রেকর্ড সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় লোকটা ৪২০—পয়লা নম্বরের জোচ্চোর, কিন্তু খুনী টাইপের নয়।

এখন সে কোথায় বলতে পারেন?

তা বলতে পারি না মশাই।

মালা দেবী এ সম্বন্ধে কোন দিন কোন আলোচনা করেন নি?

না।

আচ্ছা, সেবা করকে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আপনার সন্দেহ হয়?

ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে। ভদ্রমহিলা যদি কুন্তীকে হত্যাই করে থাকেন তাঁর পার্সোনাল গ্রাজের জন্যে, তা হলে আবার সুব্রতবাবুকে হত্যা করতে গেলেন কেন? না—না, ওঁর কাজ নয়। কি করে করেন তিনি একাজ? এই দুটো হত্যাকাণ্ডের সময়েই তিনি নিহত ব্যক্তি দুজনের থেকে এতখানি তফাতে বসেছিলেন যে তাঁর পক্ষে তাদের গ্লাসে কোন কিছু মিশিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হ্যাঁ, আমারও তাই মত। চিন্তামগ্ন কণ্ঠে গৌতম উচ্চারণ করলে কথা কটা কোন রকমে।

॥ কুড়ি ॥

মালার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা ফোন পেয়ে মনীশ একরকম ছুটতে ছুটতেই গিয়ে হাজির হলো তার বাড়িতে। সন্ধ্যা হতে তখনও বেশ বিলম্ব ছিল।

বাড়িটা খাঁ খাঁ করছিল। মনীশ একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার মুখেই সিঁড়িতে ভরতের দেখা পেয়ে গেল। চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল তাকে, হ্যাঁ ভরত, তোমাদের ছোটদিমণি কোথায়?

সংশয়াকুল হয়ে ওঠে ভরতের মন মনীশের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে, বিব্রতভাবে উত্তর দেয় সে, কেন, ছোট্‌দিমণি তো তাঁর ঘরেই আছেন।

ওঃ। বলেই ছুট্‌ দেয় মনীশ ওপরের দিকে।

মালা রাস্তার দিকের একটা জানালার সামনে চেয়ারের ওপর বসে আকুলভাবে যেন কিছু ভাবছিল। মনীশ একেবারে পাশটিতে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আলতোভাবে প্রশ্ন করলে, কি ভাবছ?

চমকে উঠল মালা। তার পর মনীশের একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ওঃ তুমি!

তুমি কি আর কাউকে প্রত্যাশা করছিলে? দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলে উঠল মনীশ।

যাও, কি কথার ছিরি!

যাক্, কি ব্যাপার বলো মলি? এবার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে মনীশ।

আজ একটা খুব বড় ফাঁড়া গেল।

কি রকম?

দুপুরে বেরিয়েছিলুম কিছু মার্কেটিংয়ের জন্যে। মোটরে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ একটা জীপ গাড়ি হুড়মুড় করে এসে পড়ে আমার গাড়িটার ওপর।

কি সর্বনাশ! তার পর? কিছু হয় নি তো?

নাঃ, বেঁচে গেছি, কিন্তু হতে পারত। গাড়িটা খুব জখম হয়েছে। স্টিয়ারিংটাই বাঁচিয়ে দিল আমাকে। বুকে খুব লেগেছে বটে, কিন্তু শরীরের আর কোথাও কিছু হয় নি।

ডাক্তারকে কল দিয়েছ? বুকটা পরীক্ষা করে নিলে পারতে একবার।

দরকার নেই। মেয়েমানুষের প্রাণ—এত চট্ করে বেরিয়ে যায় না!

জীপটাকে ধরতে পারলে?

কী যে বলো! ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমি কুপোকাত, তখন কি কোন দিকে দেখবার অবস্থা ছিল?

অর্জুনকে নাও নি নিশ্চয় সঙ্গে! খুব অন্যায় করো মলি এভাবে একলা একলা বেরিয়ে। পথে-ঘাটে বিপদ আজকাল ছড়িয়ে থাকে—তার ওপর তুমি সুন্দরী, সম্পত্তির ওয়ারিশান। না-না মলি, এরকম কাজ কখনও করো না—মনে রেখো, তোমার পেছনেও শত্রু লেগে রয়েছে।

যাঃ, কি যে বলো যা-তা, আমার পেছনে শত্রু লাগতে যাবে কেন?

কেন যাবে কি, শত্রু অলরেডি পেছু নিয়েছে তোমার।

সত্যিই? ভয়ার্ত হয়ে ওঠে মালার কণ্ঠস্বর। এদিকওদিক তাকিয়ে বলে ওঠে, কি করে বুঝলে তুমি?

ওই জীপগাড়িটা—ওটা তোমাকে যেভাবে তাক্ করে এ্যাটাক্ করেছিল, তাতে তোমার বিপদেরই সঙ্কেত করছে।

কিন্তু আমি তো কারুর ক্ষতি করি নি।

কার কী করেছ সেটা আমি কি করে বলব, তবে তোমার সাবধান হবার দিন এসে গেছে। যদি অসাবধান হও এর পর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটবে।

মালা চারদিকে তার সন্তর্পণ দৃষ্টিটা একবার বুলিয়ে নিয়ে গলার স্বরটা খাটো করে বললে, একটা কথা বলব তোমায়—কাউকে বলবে না বলো ?

আরে, কথাটাই বলো তো আগে! হাসতে হাসতে বললে মনীশ।

না, তুমি আগে কথা দাও ?

বেশ, দিলুম কথা।

ঠিক তো, কাউকে বলবে না ?

মনীশ ঘাড় নাড়লে।

তোমাকে বলি নি—কেউ জানে না, জামাইবাবু যেদিন রাত্তিরে মারা গেলেন, সেদিন রাত্তিরের ঘটনা।...

কৌতূহলী হয়ে ওঠে মনীশ, ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠে, হ্যাঁ, বলো ?

মালার মুখ কিন্তু ভয়ে পাংশুবর্ণ আকার ধারণ করেছে। কোন রকমে থেমে থেমে বললে সে, টেবিলের তলায় সেদিন সায়ানাইডের যে খালি শিশিটা পাওয়া যায় সেটা আমিই ফেলে...

তুমি ফেলো ? কী করে ? কোথায় ছিল সেটা ?

আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল। আমি আচমকা ব্যাগটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে টের পাই তা ও সকলের অলক্ষ্যে ফেলে দিই।

তোমার ব্যাগের মধ্যে গেল কি করে ? সে-সময়ে ওটা কি খালিই ছিল ?

হ্যাঁ, যেমন পাই, সেইভাবেই ফেলে দিই।

কিন্তু তোমার ব্যাগের মধ্যে গেল কি করে ওটা ? মলি, সত্যি কথা বলো আমায়।

হঠাৎ মনীশের স্বরটা কি সন্দেহপূর্ণ হয়ে উঠল ? সে কি তবে মালাকেই সন্দেহ করছে ?

কান্নায় ভেঙে পড়ে মালা। দু হাতে মুখখানা চেপে ধরে অশ্রুজড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল সে, না—না, আমি কিছু করি নি, বিশ্বাস করো আমাকে। আমি নিজেই জানি না কি করে এলো শিশিটা আমার ব্যাগের মধ্যে।

কী যেন ভাবল মনীশ কয়েক মুহূর্ত। তার পর শান্ত গলায় বললে, তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।

কোথায় ?

গৌতমবাবুর কাছে।

কেন? তাঁর কাছে কেন? কেঁপে উঠল মালার গলা।

এই কথাটা তাঁকে জানানো দরকার।

যদি তিনি আমাকেই সন্দেহ করেন?

করলেই বা। তুমি যদি দোষী না হও, ভয় কি তোমার?

না, তা বলছি না। তবে…

কোন তবে নেই এর মধ্যে, তৈরী হয়ে নাও চটপট, এখনই বেরুব।

কিন্তু…

আ মলি, চটপট তৈরী হয়ে নাও। বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে মনীশ।

মালা উঠে দাঁড়ায় ও পাশের ঘরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। হঠাৎ মনীশ চেঁচিয়ে উঠল, আচ্ছা, তুমি যখন শিশিটা ফেলে দাও, কেউ কি লক্ষ্য করেছিল তা?

ফিরে আসে মালা আবার মনীশের কাছে, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেবাকে যেন খুব অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলুম বটে সে-সময়ে।

সেবা এ সম্বন্ধে পরে তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?

কই না তো!

তা হলে বোধ হয় সেবা লক্ষ্যই করে নি ব্যাপারটা।

তা হবে। তবে দৃষ্টিটা তার আমার দিকেই ছিল যেন।

হুঁ। আচ্ছা যাও, তৈরী হয়ে এসো।

অনিচ্ছুক মালা এগোচ্ছিল, কিন্তু এবারেও তার যাওয়া হলো না ড্রেসিংরুমে, সেবার আকস্মিক আগমনে।

বিস্মিত মনীশ তাকাল মালার দিকে। মালা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, ওই যা, ভুলেই গিয়েছিলুম—তোমায় যে আসতে বলেছিলুম সেবাদি, সে কথা মনেই ছিল না একেবারে।

ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মনীশের।

সেবা বললে, কেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

মালার আগে মনীশই জবাব দিলে, একটা জরুরী কাজে ওকে নিয়ে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে সেবা দেবী। খানিকটা পরেই ফিরে আসবে ও, ততক্ষণ আপনি…

মুচকি হেসে সেবা বললে, ঠিক আছে, তার জন্যে কি, আমি না হয় পিসীমার কাছে থাকব'খন ততক্ষণ।

মালা আপত্তির সুরে বললে, কিন্তু আজকে শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে যেসব কথাবার্তা হবার কথা ছিল, সেগুলো সারা হবে কি করে ?

তুমি ঘুরে এসো, তার পরই না হয় হবে। স্নিগ্ধ স্বরে সেবা কটাক্ষ হেনে বললে, কিন্তু বেশি দেরি করো না যেন ভাই !

মালাকে এবার সত্যি সত্যিই অনিচ্ছার সঙ্গে ড্রেসিংরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হয়।

॥ একুশ ॥

সপ্রশংস দৃষ্টিতে মনীশের দিকে তাকিয়ে বললে গৌতম, মিস সেনকে আমার বাড়ীতে এনে ভালোই করেছেন। আমি যে পয়েণ্টটা নিয়ে চিন্তা করছিলুম, সেটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল। তা হলে মিস সেনই সায়ানাইডের শিশিটা টেবিলের তলায় ফেলে দেন !

বেচারাকে সন্দেহ করলেন না তো গৌতমবাবু? মনীশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে।

ঠিক এই মুহূর্তে সে এস্যুরান্স দিতে পারব না···

তা হলে আপনি ওকেও সন্দেহ করছেন ? অকস্মাৎ মনীশের মুখটা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করে, এইজন্মেই মশাই আপনাদের সংস্পর্শে কেউ আসতে চায় না—আর আপনারাও জনসাধারণের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

হঠাৎ আপনি অতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন মনীশবাবু ?

হবো না ? একটা নিরীহ নিষ্পাপ মেয়ে—এখনও সংসারের মারপ্যাচ যে আয়ত্ব করে উঠতে পারে নি, তাকেও কি না সন্দেহ করে বসলেন !

বেশ তো, তাঁর জন্তে এখনই অতটা উত্তেজিত না হয়ে উঠলেও চলত। আমার সন্দেহ হতে পারে—এর বেশি কিছু তো আর আমি বলি নি বা কোন স্টেপ নেবার চেষ্টাও করি নি। ওরকম সন্দেহ আমার এখনও

অনেকের ওপর আছে। সেটা আস্তে আস্তে ক্লারিফাই হয়ে যাবে—তার জন্যে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেবার কি আছে!

আমার বলবার কিছু থাকত না—যদি না আমি ওকে একরকম জোর করে এখানে ধরে নিয়ে আসতুম।

এনেছেন বলে আগেই তো আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তবে আমাদের সন্দেহপ্রবণ মন, সেজন্যে সন্দেহ-বাতিকটা ছাড়তে পারি না অত চট্ করে। ভালো কথা, মিস সেন কি একাই চলে গেলেন?

হ্যাঁ, ওর অভ্যাস আছে।

কিন্তু ওঁর পেছনে শত্রু লেগেছে বলে বললেন না আপনি?

হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মনীশ। কয়েক মুহূর্ত একাগ্রমনে কিছু ভেবে বললে, তা হয়তো ঠিক, তা হলে এখনই একবার ওর বাড়ির দিকে যাব নাকি?

গাড়িতে সোফার আছে তো?

না।

সে কি?

হ্যাঁ, সোফারকে না নিয়েই বেরিয়ে আসি আমরা।

কাজটা খুব ভালো করেন নি মনীশবাবু। আচ্ছা, মিস সেন বাড়ি যাবার জন্যে অত ছটফট করছিলেন কেন?

আমাদের বেরোবার ঠিক আগেই সেবা হঠাৎ এসে হাজির হয়। মালা বললে, তার আসার নাকি কথা ছিল আগে থেকেই—সুব্রতবাবুর শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে আলোচনা হবে বলে।

বাড়িতে মিস সেনের আত্মীয় বা আত্মীয়া বলতে কে আছেন এখন?

ওই পিসীমা ছাড়া কেউ নেই।

আরে উনি তো অথর্ব বুড়ী। আমি বলছি……

বুঝতে পেরেছি আপনার ইঙ্গিত। তা হলে আপনি এখন কি করতে বলেন?

চলুন, আমিও যাই আপনার সঙ্গে মিস সেনের বাড়ি।

কি বলছেন মশাই—আপনি কি করতে যাবেন?

এমনিই। চলুন একটু ঘুরে আসি।

মনীশের চোখমুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

বাড়ির মধ্যে দ্রুত ঢোকার মুখে দরজায় অপেক্ষমান দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে মনীশ, দিদিমণি এসে গেছেন রামলগন ?

হ্যাঁ বাবু, আধ ঘণ্টা আগে।

মোটর কোথায় গেল—দেখছি না তো!

দিদিমণি তুলে রাখবার হুকুম দিয়েছেন।

ওঃ। পুরোপুরি স্বস্তির নিশ্বাস একটা বেরিয়ে আসে মনীশের বক্ষ ভেদ করে। গৌতমের দিকে একবার চেয়ে স্মিতহাস্যে দারোয়ানকে আবার প্রশ্ন করে, দিদিমণি এখন কোথায় জানো ?

না বাবু, বোধ হয় উপরে আছেন।

আচ্ছা। বলে বেশ ধীরেসুস্থে মনীশ বাড়ির ভেতর দিকে এগোল। গৌতম তাকে অনুসরণ করল পিছু পিছু।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে প্রথমেই ড্রইংরুম পড়ল। মনীশ ও গৌতম দুজনেই ঢুকল ঘরের মধ্যে, দেখল সেখানে কেউ নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে কোন্ দিকে যাবে ভাবছে মনীশ, এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে প্রভাসুন্দরীর গলার স্বর ভেসে এলো তার কানে।

দ্রুত ছুটে গেল দুজনে সেদিকে। ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কানে এলো তাদের, কি আশ্চর্য, এরা গেল সব কোথায় ? কতক্ষণ আর আমি বসে থাকব ?

হুড়মুড় করে দুজনে এসে বৃদ্ধার সামনে দাঁড়াল। প্রভাসুন্দরী ডান হাতটা চোখের ওপর তুলে ধরে চোখটা কুঁচকে ঠাহর করবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন, কে তোমরা—কাকে চাই ?

আমি—আমরা মনীশ ও গৌতমবাবু। মালা কোথায় পিসীমা ?

বৃদ্ধা বোধ হয় চিনতে পারেন গৌতমকে, মৃদু হেসে বললেন, ওঃ, তুমি গৌতম! দেখ দিকি বাবা, মালা আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় চলে গেল!

কতক্ষণ আগে ? গৌতমের কণ্ঠ থেকে উদ্বেগাকুল স্বর বেরিয়ে আসে।

তা প্রায় আধঘণ্টা আগে। কোথায় যেন বেরিয়েছিল—ফিরে এসে দেখা করে বললে, এখনই আসছি আপনি একটু বসুন পিসীমা। তার পর সেই যে গেল, এখনও ফিরল না।

সেবা কোথায়? আসে নি সে আপনার কাছে? প্রশ্ন করে মনীশ।

না তো! তারও তো আজ বিকেলে আসবার কথা ছিল!

মনীশ ও গৌতম পরস্পরের দিকে তাকাল একবার।

মনীশ আবার জিজ্ঞাসা করলে, মানদা আর ভরত গেল কোথায়?

মানদা তো ছিল একটু আগে। আর ভরত ছুটি নিয়ে গেছে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে—কার সঙ্গে নাকি দেখা করবে।

প্রশ্ন করল এবার গৌতম, আপনি এই আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন মালার জন্যে—কাউকে দিয়ে ডাকতে পাঠান নি কেন তাকে?

কাকে পাঠাব বাবা—কেউ তো আসে নি তার পর!

গৌতম ইশারায় কি যেন বললে মনীশকে। মনীশও ইশারায় সায় দিয়ে সমর্থন করল তা। তার পর উভয়ে একসঙ্গে দরজার দিকে পা বাড়াল। যাবার আগে গৌতম বৃদ্ধার একেবারে পাশে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, আপনি আর একটুক্ষণ বসুন, আমরা মালাকে খুঁজে নিয়ে এখনই ফিরে আসছি।

হতভম্ব প্রভাসুন্দরী ফ্যাল ফ্যাল করে অপস্রিয়মান যুবক দুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন শুধু, কণ্ঠে তাঁর ভাষা জোগায় না।

ছুটতে থাকে দুজনেই। যেন ধৈর্য আর ধরে রাখতে পারছে না উভয়েই। আগে আগে এগোচ্ছে মনীশ—পিছনে গৌতম তাকে অনুসরণ করছে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে।

থমথম করছে সমস্ত বাড়িটা। প্রেতপুরীর মতই মনে হচ্ছে তা। অত বড় বাড়িটার কোথাও কোন জনমানবের স্বাক্ষর নেই। এগোতে এগোতে তাই দুজনের শরীর বারে বারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে থাকে।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ খাড়া হয়ে যায় দুজনে। একজন কে যেন নেমে আসছে অত্যন্ত সন্তর্পণভাবে সিঁড়ি বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে আবার নেমে এলো দোতলায় ও সিঁড়ির পাশের ঘরখানার মধ্যে ঢুকে গেল চোখের পলকের মধ্যে।

মিনিট দুই অপেক্ষা করল দুজনে সেই ঘরের মধ্যে। কিন্তু কাউকে নেমে আসতে আর দেখল না ওপর থেকে। অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায় ওরা।

পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মনীশ ও সিঁড়ির ধাপ-গুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দ্রুত গতিতে ওপরে উঠতে লাগল। গৌতম মুখ বুজে আগের মত অনুসরণ করে চলল।

তেতলার সিঁড়ির মুখেই মালার ঘর। দরজার সামনে এসে মৃদুস্বরে ডাকলে মনীশ, মালা! মালা! মলি!

কোন সাড়া নেই।

দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল মনীশ। কিন্তু তবুও কোন আওয়াজ বা সাড়া পাওয়া গেল না ভেতর থেকে।

গৌতম এতক্ষণ ঘরটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ঘরের সমস্ত জানালাই ভিতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছিল—তা অনুভব করতে পারল গৌতম অন্ধকারের মধ্যে থাকতে থাকতেই। হঠাৎ যেন মনে হলো গৌতমের একটা বন্ধ জানালার কাছে গিয়ে—গ্যাসের মত কিছু একটা ফুস ফুস করে বেরিয়ে আসছে হাওয়ার সঙ্গে ছোট্ট একটা ছিদ্র থেকে। ছুটে গিয়ে মনীশকে ডেকে নিয়ে এলো সে ও তাকে গন্ধটা সোঁকালো।

চীৎকার করে উঠল মনীশ তীব্রকণ্ঠে, গৌতমবাবু, শিগগির দরজা খোলার ব্যবস্থা করুন, নইলে মালাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। বিষাক্ত গ্যাসে সে বোধ হয় এতক্ষণে শেষই হয়ে গেল।

মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই গৌতমের ও মনীশের মিলিত চেষ্টায় সেই জানালাটা ভেঙে পড়ল। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল দুজনে ঘরের মধ্যে। আগে মনীশ ও পিছনে গৌতম। দুজনেরই লক্ষ্য মালার বিছানা।

মালা শুয়ে ছিল বিছানার ওপর। চোখেমুখে তার আতঙ্কের ছাপ। কিন্তু জ্ঞান নেই। প্রগাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে আছে সে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে। একটা নল থেকে গ্যাস ক্রমাগত বেরিয়ে চলেছে তার উন্মুক্ত মুখ ও নাকের ওপর।

সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে সেই বিষাক্ত গ্যাসে। গৌতম আর মনীশের অবস্থাও হয়ে উঠেছে সঙীন। তারাও আর দাঁড়াতে পারছিল না। কোন রকমে টলতে টলতে তারা দুজনে ধরাধরি করে মালাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলো ও ঘরের সামনে উন্মুক্ত ছাদের ওপর

শুইয়ে দিলে।

গৌতম বললে, আমি এখানে থাকলুম, আপনি শিগগির একজন ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করুন।

মনীশ ছুটছিল, গৌতম তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল আবার, ঘাবড়াবেন না, মিস সেন ভালো হয়ে যাবেন। ওঁর ফাঁড়া কেটে গেল এযাত্রা—আমাদের ঠিক সময়ে এসে পড়ায়।

মনীশ দোতলায় নেমে এলো। তার পর টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ডাক্তারকে আহ্বান জানিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে আসবার জন্যে অনুরোধ করে যে-মুহূর্তে রিসিভারটা রেখেছে যন্ত্রটার ওপর, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রভাসুন্দরী, ডাক্তার? ডাক্তার কেন? কার কি হয়েছে?

চমকে উঠেছিল মনীশ বৃদ্ধার আকস্মিক চিৎকারে। তার পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, মালা—মালাকে জানালা ভেঙে এইমাত্র উদ্ধার করলুম আমরা। বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে ভেতর থেকে বন্ধ ঘরে পড়েছিল সে।

মালা? একটা তীব্র তীক্ষ্ণ বুকফাটা চিৎকার করে উঠলেন প্রভাসুন্দরী, মালাও শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল? ওমা কি হবে—একথা যে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি!

দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলে উঠল মনীশ, আপনাকে বিশ্বাস করতেও হবে না। সত্যি এটা সত্য নয়।

॥ বাইশ ॥

ওঃ তুমি !…ওমা, আপনিও আছেন ?

মৃদুস্বরে বলে উঠল মালা তার জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম কথা ফুটল তার কণ্ঠে।

ভোরের আলো সদ্য ফুটে উঠেছে বিভীষিকাময় রাত্রির অবসানে। পূর্ব গগনে উষার আলোর ছোঁয়াচ এখনও লাগে নি।

একগাল হেসে শায়িতা প্রিয়ার ডান হাতখানার ওপর আলতোভাবে হাত বোলাতে বোলাতে মনীশ বললে, আমি জানতুম তোমার জ্ঞান ফিরে আসবে—ভগবান যে এতখানি নিষ্ঠুর হবেন না সে আমি জানতুম।

তৃপ্তির হাসি হেসে গৌতমের দিকে ফিরে মালা বললে, আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারছি—আজ কার দয়ায় এ নবজীবন লাভ করলুম……

না-না মিস সেন, আমি নই—আমি কি আর করলুম! যদি সত্যি-কারের কিছু করে থাকেন তো ডাক্তারবাবুই করেছেন। আমার যা ধারণা ছিল তা যে কতখানি ভুল তার প্রমাণ দিলেন ডাঃ বোস। সারা-রাত্রি ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি যেভাবে বাঁচিয়ে তুললেন আপনাকে তা সত্যিই মুগ্ধ করে দিয়েছে আমাকে।

মালা তার দুর্বল ঘাড়টা ঘুরিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ডাঃ বোসের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলে তিনি বলে উঠলেন, না-না, এখন নড়বেন না বেশি বা কথা বলারও চেষ্টা করবেন না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক সুযোগ পাবেন পরে, আপনার হার্ট এখন খুবই দুর্বল—দেখবেন আমার সব শ্রম না ব্যর্থ হয়ে যায়।

গৌতম বললে, ঠিক। এ সময়ে মিস সেনকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না। ওঁর এখন পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

ম্লান একটুকরো হাসি খেলে গেল মালার শুকনো ঠোঁটের ওপর দিয়ে। পর্যায়ক্রমে সকলকার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ বুজল সে আবার।

সেইদিনই দুপুরে লালবাজারে কমিশনারের কক্ষে ফুল-বেঞ্চ মিটিং-এ গৌতম তার লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছিল :

আপনারা সকলে জানেন কুন্তীবাঈ নিহত হন এক বছর আগে। কিন্তু সে-সময়ে সে-মৃত্যুটাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। না দিয়েও উপায় ছিল না, কারণ আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি কুন্তীবাঈ আত্মহত্যা করেন ?

মৃত সুব্রত রায়—কুন্তীবাঈয়ের স্বামী প্রথমে ওই সন্দেহই পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর সে সন্দেহ মন থেকে ধুয়েমুছে যায় দুখানা বেনামী চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। চিঠি দুটোতে লেখা ছিল, তাঁর স্ত্রী কুন্তীবাঈ আত্মহত্যা করেন নি—কেউ তাঁকে হত্যা করেছে। ব্যস, সুব্রতবাবু লেগে গেলেন খোঁজখবর করতে। কিন্তু তিনি কতদূর সাফল্য হয়েছিলেন জানি না—তার আগেই বেচারাকে প্রাণ দিতে হলো অত্যন্ত আকস্মিকভাবে।

সুব্রতবাবুর মৃত্যুর দিনে আমি তাঁর কাছাকাছি ছিলুম। আমাকে অবশ্য কেউ চিনতে পারেন নি—কিন্তু আমি একজন খানসামার ছদ্মবেশে সব সময়ে তাঁর পাশেপাশেই ছিলুম। কিছুতেই বুঝতে পারলুম না প্রথমটায় কি করে এই ঘটনাটা ঘটল। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলুম ভেতরের রহস্যটুকু বার করবার জন্যে।

এখন বলতে দ্বিধা নেই, সে রহস্যের সন্ধান পেয়েছি। ঘরের আলো যে-সময়ে হঠাৎ নিভে যায় সুব্রতবাবুর পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী, সকলেই তাড়া-হুড়ো লাগিয়ে দেন টেবিল থেকে উঠে পড়ার জন্যে। সেই সময়ে জনৈকা মহিলার হ্যাণ্ডব্যাগ গোলমালের মধ্যে তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে যায়। সে ব্যাগ ছিল মিসেস ভোসের। ওই ভিড়ের মধ্যে অন্ধকারে ব্যাগটি খোঁজাখুঁজি আর না করে মিসেস ভোস এগিয়ে যান সামনের দিকে। কিন্তু একজন খানসামার নজরে পড়ে তা। সে কার ব্যাগ কোথায় রাখতে হবে অতশত না বুঝে সেটি টেবিলের ওপরেই রেখে দিলে এক-পাশে।

এর পর কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বললে অতিথিরা সকলে আবার ডাইনিং-টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লেন। কিন্তু গোল্ রাউণ্ড টেবিলে কারো জায়গা নির্দিষ্ট করা ছিল না। তা হলে কে কোথায় বসলেন ?

মিসেস ভোসের ওই ব্যাগটিই তখন নিশানার কাজ করল। যদিও ঠিক ওই জায়গাটিই তাঁর নির্দিষ্ট স্থান ছিল না—তবু ব্যাগটির নিশানা অনুযায়ী তিনি সেই জায়গাটিতেই গিয়ে বসলেন। ফলে অন্যান্য অতিথিরাও সেইভাবে বসলেন সকলে—ঠিক সুব্রতবাবু যেভাবে সকলকে বসিয়েছিলেন কয়েক মিনিট আগে। সুব্রতবাবু নিজেও ধরতে পারলেন না তাঁর মারাত্মক ভুলটা।

তার পর যা ঘটবার তাই ঘটল। সুব্রতবাবু অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তার দরুণ তৃষ্ণার্ত বোধ করে গ্লাসটি তুলে নিলেন ও নিজের গ্লাস ভেবে জলে চুমুক দিলেন। আসলে কিন্তু সে গ্লাসটি মিস সেনের উদ্দেশ্যে রাখা ছিল এবং অদৃশ্য আতায়ী গ্লাসটিতে হাইড্রোজেন সায়ানাইড মিশিয়ে রেখেছিল মিস সেনকেই হত্যা করবার জন্যে।

মারা গেলেন সুব্রতবাবু মিস সেনের জায়গায়। ঘটনাটা এমন আকস্মিকভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেল যে আততায়ী নিজে পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। একজনকে টারগেট করে আততায়ী যে সুনিপুণ চাল চেলেছিল তা যে এভাবে উল্টে যাবে এটা সত্যিসত্যি ধারণার বাইরে ছিল তার। মিস সেন মারা যাবেন—সেই ভাবে প্রস্তুত হয়েই ছিল সে, আর সেজন্যে পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী মিস সেনের হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে সায়ানাইডের ছোট শিশিও একটা রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করে—যাতে প্রত্যেকের ধারণা হয়, মিস সেন তাঁর দিদির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাভিভূতা হয়েই নিজেও আত্মহত্যা করলেন তাঁর দিদির মত!

এই সময়ে মনীশ দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু মালাকে হত্যা করতে চায় কেন আততারী? কি উদ্দেশ্য তার?

সেই পুরনো কথা—টাকা, টাকা, টাকার জন্যে! কুন্তীবাঈ মারা যাবার আগে উইল করে স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি মিস সেনকে দান করে যান। বর্তমানে মিস সেনই হচ্ছেন ওই বিরাট সম্পত্তির একমাত্র মালিক। এখন তাঁকে যদি কোন রকমে সরিয়ে ফেলা যায়—তাঁর বিয়ে হবার আগেই তাঁকে যদি হত্যা করতে পারা যায়, তা হলে সেই সম্পত্তি আইনানুসারে বংশের নিকটতম ব্যক্তিরই প্রাপ্য হবে। কুন্তীবাঈ ও মালার তরফে এমন কেউ নেই যে ক্লেম করতে পারে সে-সম্পত্তি—একমাত্র বৃদ্ধা প্রভাসুন্দরী ও তার ছেলে রতন গুপ্ত ছাড়া। তা হলে প্রভাসুন্দরী ও

রতন গুপ্ত দুজনকে পাচ্ছি আমরা এস্থলে সম্ভাব্য আততায়ী হিসেবে। তাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতো মিস সেনের মৃত্যুতে। কিন্তু বৃদ্ধা প্রভাসুন্দরী একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছেন, তাঁর দ্বারা এই নৃশংস কাজ করা আর সম্ভব নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে একমাত্র আততায়ী দাঁড়াচ্ছে রতন গুপ্ত—যার দ্বারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দুটির প্ল্যান তৈরী হয়েছে।...

কিন্তু রতন তো এখন রেঙ্গুনে! আজ প্রায় বছর খানেকের ওপর সে বর্মামুলুকে বাস করছে।

তাই কি? ভুল। সকলকার সব ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে ভরা।...সব গল্পের উৎপত্তি হয় যেভাবে অর্থাৎ নারীর সঙ্গে নরের সাক্ষাতে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় যেমন, ঠিক সেইরকম পরিবর্তনই ঘটে এক্ষেত্রেও—সেবা করের সঙ্গে রতন গুপ্তের সাক্ষাতের মুহূর্তেই। রতন তার স্বাভাবিক বাকচাতুর্যের গুণে চোখের পলকেই সেবার হৃদয় জয় করে নিতে সক্ষম হয়। সাদাসিধে মেয়ে সেবা রতনের শয়তানি বুদ্ধির কাছে পারবে কেন—অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে সে তার হাতের ক্রীড়নক করে তুলল।

এবার সেবার ব্যাপারে আসা যাক্। সেবা রতন সম্পর্কে যেমন স্টেটমেণ্ট দিয়েছে, তাই গ্রহণ করেন সুব্রতবাবু। কারণ সেবাকে তিনি সন্দেহ করেন নি এক মুহূর্তের জন্যেও। সেবাই ব্যবস্থা করেছে রতনের সঙ্গে দেখা করে তার বাইরে যাওয়া সম্পর্কে এবং তার পর সুব্রতবাবুর মৃত্যুর দিনে সেবাই সব ভার নেয় রতনের ও তথাকথিত এক বান্ধবীর ভাইয়ের নাম করে পুরোপুরি ধোঁকা দেয় সুব্রতবাবুকে।...অবশ্য এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে আপনাদের মনে—তা হলে সুদূর বর্মামুলুক থেকে রতনের দেওয়া যে-চিঠি ও টেলিগ্রাম আসছিল কলকাতায় সেগুলি পাঠাচ্ছিল কে? রতন যদি কলকাতাতেই ছিল, তা হলে সেগুলো বর্মামুলুক থেকে আসে কি করে? সেটার উত্তর অত্যন্ত সোজা—রতনই তার এক জোচ্চোর বন্ধু মারফৎ এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল ও তাকে তার প্রাপ্য থেকে কিছু কিছু অংশ ছেড়ে দিচ্ছিল কমিশনের মত। সেই বন্ধু বর্মার একজন নামকরা শয়তান—নাম তার হারাধন কর্মকার।

কি ভীষণ! রতন তা হলে বরাবর কলকাতায় ছিল ও আমাদের পাশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল?

হ্যাঁ মিঃ লাহাড়ী। রতন এক বছর আগে কুন্তীবাঈয়ের মৃত্যুর দিনে যেমন শিশমহলে উপস্থিত ছিল, ঠিক সেরকম সুব্রতবাবুর মৃত্যুর দিনেও শিশমহলে সমস্তক্ষণ আমাদের চারপাশে ঘুরে ফিরে বেরিয়েছে।

নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে ছিল ?

হ্যাঁ, খানসামার ছদ্মবেশে ছিল।

তা হলে কেটারার দত্ত এণ্ড বড়াল কোম্পানির ম্যানেজার বলল কি করে যে তাদের প্রত্যেকটি লোকই পুরনো এবং বিশেষ বিশ্বস্ত ?

ম্যানেজার হেড খানাসামার বিবৃতির ওপর নির্ভর করে ওই স্টেটমেণ্ট দেয়। আর হেড খানসামা যেটা বলে সেটা কতকটা প্রাণভয়ে আর কতকটা তার লোকের সততার ওপর নির্ভর করে। কারণ এরকম ঘটনা এর আগে তার জীবনে সত্যিসত্যিই ঘটে নি তো!

কিন্তু মালার ব্যাগের মধ্যে সায়ানাইডের শিশিটা গেল কি করে ? মনীশ আবার প্রশ্ন করে বসে গৌতমকে।

সে ভার নেয় সেবা। দু-দুবার একাজ করল সে। প্রথমবার করে কুন্তীবাঈয়ের বেলায় এবং দ্বিতীয়বার মালার বেলায়। প্রত্যেক বারেই যখন দুজনে ব্যস্ত ছিল নাচ-গানে, অর্থাৎ প্রোগ্রামে তাদের অংশটুকু সারবার জন্যে উঠে যায় যথাস্থানে—ব্যাগটা জমা রেখে যায় সেবার কাছে, আর সেবা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। আর ওদিকে রতন খানসামার ছদ্মবেশে বিনা সন্দেহে সায়ানাইডের শিশি উজাড় করে দেয় গ্লাসের মধ্যে।

আচ্ছা, চিঠি দুটো কে লিখেছিল ধরতে পারলে গৌতম ? কমিশনার স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করে ওঠেন গৌতমকে।

সুব্রতবাবুকে লেখা বেনামা চিঠি দুটো তো ? হ্যাঁ স্যার, ধরতে পেরেছি। সেবাই লেখে ওই দুটো।

তা হলে সেবা যে অস্বীকার করে তা তোমার কাছে!

বুঝতেই পারছেন অস্বীকার না করে উপায় ছিল না তার। শুধু যে চিঠি দুখানা লেখে সে তা নয়, তা পাবার পর সুব্রতবাবু যখন তার কাছে পরামর্শ করেন সে-সম্পর্কে, কিভাবে কাজ করতে হবে সে-সম্বন্ধেও হদিশ দেয় সে। তার পর তারই পরামর্শ অনুযায়ী সুব্রতবাবু শিশমহলে আবার সেই পুরনো ফাংশনের পুনরাবৃত্তি করবার ব্যবস্থা করেন ও সুনন্দা

ব্যানার্জিকে নিয়োজিত করেন কুন্তীবাঈয়ের পার্ট করবার জন্যে। আসলে কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য ছিল মিস সেনকে সরিয়ে দেবার। কিন্তু তাদের মতলব হাসিল হলো না—অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন তিনি। রতন কিন্তু অত অল্পে দমল না। একজনের একটা জীপ গাড়ি চুরি করল সে। তার পর সেবাকে দিয়ে একটা ফলস কল-এ মালাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল ও তাকে মোটর এ্যাকসিডেণ্টে জখম করবার জন্যে জীপ গাড়ির সঙ্গে কলিশন করাল। সে চেষ্টাও কিন্তু সফল হলো না তার।

রতন তখন মরীয়া। সেবাকে দিয়ে এবার সে মোক্ষম ব্যবস্থাটাই করাল। মিস সেন আমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে দেখলেন সেবা তার আগেই চলে গিয়েছে। তখন তিনি প্রভাসুন্দরীর কাছে আর না বসে সোজা তাঁর ঘরে চলে গেলেন জামাকাপড় ছাড়বার জন্যে। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে সবেমাত্র তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময়ে দরজায় মৃদু টোকার শব্দে চকিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে পুনরায় এসে খিলটা খুলে দিলেন। মুহূর্ত মাত্র। সেবা বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর একখানা বিরাট চাদর নিয়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে তৈরী ছিলেন না মিস সেন। হয়তো তিনি বাধা দিতেন, কিন্তু সেবা তো একলা ছিল না—তার পিছনে ছিল বুদ্ধিদাতা রতনও।

এর পর রতনের পক্ষে অসুবিধা হলো না বাকি কাজটুকু সেরে ফেলার। মিস সেনকে ক্লোরোফরমে অজ্ঞান করে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিল তাঁকে রতন ও গ্যাসের সিলিণ্ডার এনে তাঁর নাকের কাছে বসিয়ে রাখল—যাতে ঝির ঝির করে গ্যাসটা বেরিয়ে ধীরে ধীরে বিষাক্ত করে তোলে তাঁকে ও শেষ পর্যন্ত একেবারে শেষ হয়ে যান তিনি। ইত্যবসরে সেবা তার কাজটুকু সেরে ফেলল চট্‌পট্‌—ঘরের সব দরজা-জানালাগুলো আঁটসাঁট ভাবে বন্ধ করে দিল এক-এক করে, তার পর দুজনে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে ও ওই ঘরেরই অদূরে অপেক্ষা করতে থাকল শেষটুকু দেখে যাবার জন্যে।

থামল গৌতম একটুক্ষণের জন্য।

তার পর? অধৈর্য হয়ে জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করে ওঠেন।

শেষটুকু আর দেখা হয়ে উঠল না বেচারাদের ভাগ্যে। ডাক্তারকে কল দিয়ে মনীশবাবু যখন ওপরে উঠে আসছিলেন, হঠাৎ একেবারে

সামনাসামনি পড়ে গেলেন সেবার। মনীশবাবু উপস্থিত-বুদ্ধিবলে সেবাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলেন এবং আমিও বিনা কষ্টে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করে ফেললুম। কিন্তু রতনকে ধরতে পারলুম না। সে পালাল।

আজ এই কিছুক্ষণ আগে তাকে ধরেছি সেই জীপ গাড়ি সমেত। অবশ্য এ ব্যাপারে সেবার স্টেটমেণ্ট কিছুটা সাহায্য করেছে আমায়। না হলে বোধ হয় অত চট্ করে ধরতে পারতুম না তাকে। ওর গোপন আড্ডার ঠিকানা আমি সেবার কাছ থেকেই সংগ্রহ করি।

একজন ডি সি জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, আচ্ছা, সেবার কি স্বার্থ ছিল এ ব্যাপারে? সে কেন ওই স্কাউণ্ড্রেলটার সঙ্গে মিতালি পাতাল?

কুন্তীবাঈয়ের ওপর রাগে এবং ঘৃণায়। তার পর রতনের স্তোকবাক্যে—সব ঝঞ্ঝাট কেটে গেলে, সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এলে তাকেই সে বিয়ে করবে এই আশ্বাস পেয়েছিল বলে।

সত্যিই কি তা করত রতন শেষ পর্যন্ত?

সেবার অন্তত তাই ধারণা ছিল।

বেচারা! পূর্বোক্ত ডি সির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো।

সত্যি বেচারা। যদি সেবা আদৌ রতনের সংস্পর্শে না আসত, বোধ হয় এই হীনপথে এসে পড়ত না সে। তার মত সরল সাদাসিধে মেয়ে এত ঘোরপ্যাচের কারবার বোঝে নি গোড়ায়, কিন্তু যখন বুঝল তখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এগোতেও ভয় পাচ্ছে—আবার পেছোতেও সাহস হচ্ছে না। সচরাচর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে।

কমিশনার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, ব্রেভো মাই বয়! সত্যিই তুমি একটা অসম্ভব কাজকে সম্ভব করলে। এ রহস্যের সন্ধান এত সহজে আর এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কারুর দ্বারা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। তোমার কাজের সত্যিই তুলনা হয় না।

গৌতম স্মিতহাস্যে ঘাড় নীচু করে বসে রইল।

মনীশ বললে, গৌতমবাবু, আপনাকে সামনের রবিবারে কিন্তু একবার কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে—না বললে শুনব না।

নিশ্চয়ই যাব। তবে কোন্ বাড়িতে?

হো হো করে হেসে উঠলেন সকলে।

মনীশ ঘাড় নীচু করে বিনীতভাবে বললে, মালার বাড়িতে—এখন থেকে আমাকে ওখানেই পাবেন।

কমিশনার স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, ভেরী গুড, আমরাও যাব তো সেই সঙ্গে!

আবার একপ্রস্থ হাসির ঢেউ উঠল ঘরের মধ্যে। মনীশ সলজ্জকণ্ঠে কোন রকমে উচ্চারণ করলে, নিশ্চয়ই স্যার, যাবেন বৈকি—আপনাদের সকলকে মালা নিজে এসে ইনভাইট করে যাবে।

মনীশ উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অন্যান্য সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর কমিশনারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌতম ও মনীশ একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পাশাপাশি।

॥ সমাপ্ত ॥